বিষয়-সূচী

ভূমিকা

মেয়েটির নাম সুলতানা। মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে আসত। আমরা তখন বাঁকুড়ায়। সালটা ১৯৩০। কথাপ্রসঙ্গে সুলতানা বলে, "বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে আমার খুব ভাব।" আশ্চর্য হয়ে ভাবি সে নিজে কি বাঙালী নয়? ওরা কি তবে অবাঙালী? খোঁজ নিয়ে জানা গেল ওরা বাঙালী মুসলমান। কিন্তু হিন্দুকে বাঙালী ও বাঙালীকে হিন্দু ভাবতে অভ্যস্ত। পার্থক্য বোঝানোর জন্যে নিজেদের মুসলমান বলেই ভাবে, বাঙালী বলে নয়। অপর পক্ষে বাঙালী হিন্দুদেরও একই অভ্যাস। বহুবার শুনেছি, "আমরা বাঙালী, ওরা মুসলমান।" সাহিত্যে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'ই তো বলেছে, "আজ মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালীদের খেলা।" ভাগলপুরে কিন্তু ভাষাগত অমিল ছিল। বাঁকুড়ায় বা বাংলাদেশের আর কোথাও তো সেটা ছিল না।

সেই সুলতানাকেই আবার দেখি ১৯৭০ সালে ঢাকায়। ততদিনে মুক্তিযুদ্ধ ঘটে গেছে। বাঙালী ও অবাঙালী মুসলমানে ভাষাগত প্রভেদ যে কত গভীর তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয়নি। রক্তপাতই তা বুঝিয়েছে। সুলতানা তখন বাঙালী। হঠাৎ একদিন আমাদের হোটেলের ঘরে এসে হাজির। আমার স্ত্রী তাকে চিনতে পারেন। সে আর সেই ষোড়শী সপ্তদশী নয়। ষাটের কোঠায় পড়েছে। তাকে 'সে' বলা ঠিক হবে না। তিনি একজন বেগম। আমার স্ত্রী সেদিন শয্যাশায়ী। আমি তাঁকে একা রেখে সভায় যাব কী করে তাই ভাবছি। সুলতানা বেগম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর ভার নেন। ঘণ্টা দু'তিন বাদে ঘরে ফিরে দেখি সুলতানা তখনো সেখানে। ইতিমধ্যে ডাক্তার দেখিয়েছেন, ওষুধপত্র কিনেছেন। সবই নিজের খরচে। আমি কী বলে ধন্যবাদ দেব? এবার বোঝা গেল, বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে কে দেখবে?

গত মুক্তি যুদ্ধেও কি সেটা দেখা যায়নি ? ওপারের বাঙালীকে এপারের বাঙালী না রাখলে কে রাখত ? স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়তো ওপারের মাটিতে বসেই সম্ভব হতো, কিন্তু সরকার পরিচালনার জন্যে এপারে না এলে চলত না। পরে আবার পাঁচিল উঠেছে। বাংলাভাষাকে আড়াল করেছে ইসলাম ধর্ম। ইসলামী রাষ্ট্র পত্তনের উদ্যোগ চলেছে। তা চলুক। কিন্তু আল্লাহ্ না করুন, দুর্দিন যদি আবার ওপারে ঘনিয়ে আসে কেবল কি হিন্দুরাই পালিয়ে আসবে, মুসলমানরাও আসবে না ? আগের বার তো মুসলমানরাই আসে প্রথমে। গোড়ার দিকে তারাই ছিল সংখ্যাধিক। বাঙালীকে বাঙালী না রাখলে কে রাখবে ? আরব, ইরানী, পাকিস্তানী ? এইসব অবাস্তববাদীদের বাস্তববোধ উদয়ের পরে এপারের সঙ্গে ওপারের সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হবে।

এই মহৎ কর্মে যিনি আজীবন নিযুক্ত রয়েছেন সেই অশীতি বর্ষোত্তর সাহিত্যসাধক জনাব রেজাউল করিম সাহেবের অসংখ্য নিবন্ধের থেকে বাছাই করে কয়েকটি সংকলিত হয়েছে। বেশীর ভাগই দেশভাগের পূর্বে লেখা। তাঁর কথা শুনলে ধর্ম অনুসারে দেশভাগ হয়তো ঘটত না। কিন্তু সাহিত্যিকদের সাধ্য কী যে রাজনীতিকদের হাত থেকে নিরীহ জনগণকে বাঁচায়! ধর্মের নামে ওরা নাচে। পরে প্রাণে মরে বা প্রাণ নিয়ে পালায়। শিক্ষা অমনি করেই হয়। বই পড়ে হয় না। তবু বইয়ের প্রয়োজন আছে। স্থায়ী মূল্যও আছে। করিম সাহেবের বাণী কালজয়ী হবে। মৈত্রীর সাধনা কখনো নিষ্ফল হয় না। সময়ে ফল ফলে।

ইতিহাসের যে অলিখিত নিয়ম মেনে বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়ায়, তিব্বতে, সিংহলে, বার্মায়, চীনে, জাপানে, কোরীয়ায়, মঙ্গোলিয়ায়, সাইবেরিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীনে, থাইল্যান্ডে ও অন্যত্র সম্প্রসারিত হয়, যে নিয়ম মেনে খ্রীষ্টধর্ম প্যালেস্টাইনের বাইরে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় সম্প্রসারিত হয় সেই নিয়ম মেনে ইসলামও বিশ্বের নানা দেশে ও মহাদেশে সম্প্রসারিত হয়। আলো বাতাসের মতো ধর্মও সম্প্রসারণশীল। দেশের চারদিকে বেড়া দিয়ে তাকে আটকানো যায় না। আটকানো উচিতও নয়। মানুষ তো কেবল জাতীয়তাবাদ নিয়ে বাঁচে না, স্বদেশী নিয়ে বাঁচে না। তার মৃত্যুর পর তার

আত্মার কী হবে না হবে সেটাও তাকে ভাবতে হয়! যে ধর্মবিশ্বাস তাকে নিশ্চিতি দেয়, অভয় দেয়, আশা দেয় সেই ধর্মবিশ্বাসের দিকেই সে ঝোঁকে। এমনি আরো কয়েকটি কারণে সে তার পূর্বপুরুষের ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মের আশ্রয় নেয়। এটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার। কারণ মুক্তি বা স্বর্গ বা নির্বাণ বা স্যালভেশনও ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের ব্যাপার। মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ।

ইসলাম ইতিহাসের নিয়মেই ভারতে আসত ও ব্যাপ্ত হতো। গোল বেধেছে এই নিয়ে যে ইসলাম কেবল একটি ধর্মবিশ্বাস নয়। সে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনচর্যা। সমাজ, রাষ্ট্র, আর্থিক ব্যবস্থা, জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় মানবিক কার্যকলাপ ইসলামের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। একই রকম দাবী করে খ্রীস্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে কোনো মতে একবার রাজাকে দীক্ষিত করতে পারলে তার শাসনাধীন প্রজাদেরও ছলে, বলে, কৌশলে দীক্ষিত করতে পারা যায়। ধর্ম যদি রাজশক্তির সাহায্য না নিত তা হলে তার সম্প্রসারণ এমন ব্যাপক হতো না। আর রাজশক্তি মানে তো তরবারির শক্তি। তরবারির বিরুদ্ধে মানবাত্মা বিদ্রোহ করবেই। তার থেকে আসে যুদ্ধবিদ্রোহ, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব। ফরাসীরা প্রতিষ্ঠা করে সেকুলার স্টেট, চার্চের সঙ্গে যার কোন সম্পর্কই নেই। রাশিয়ানরাও সেকুলার স্টেট প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু সেইখানে ক্ষান্ত হয় না। চার্চের অস্তিত্বই রাখে না। আমাদের এ দেশে তুর্ক, মোগল ও ব্রিটিশ শাসনের সময় রাষ্ট্রের একটা ধর্মীয় বিভাগ ছিল। হিন্দু শাসনে তো ছিলই। সে বিভাগ আর নেই। ধর্মের জন্যে রাষ্ট্র এক পয়সাও খরচ করে না খাজনা ধার্য করে না। এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ভারতরাষ্ট্র কারো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করতে চায় না। স্বাবলম্বী হলে প্রত্যেকটি ধর্মপ্রতিষ্ঠান নির্বিঘ্নে কাজকর্ম করতে পারে। বিবাদ যেখানে বাধছে সেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে নয়, পরস্পরের সঙ্গে।

রেজাউল করিম সাহেবের বই পারস্পরিক বোঝাপড়ার সহায়ক হবে। তাঁর মতে সব ধর্মের একই লক্ষ্য। সত্যিকার ধার্মিক যারা তাঁরা এটা স্বীকার করেন। আমাদের রাজবাড়ীতে মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ, ব্রাহ্ম সকলেই সমাদর পেতেন। দেশীয় রাজ্যে আমার জন্ম ও বাল্যজীবন। আমাদের

বাড়ীতেও সকলের জন্য অবারিত দ্বার। তবে এটার নাম সর্বধর্ম সমন্বয় নয়। প্রত্যেকটি ধর্মের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা নিজের মতো করে বুঝলে চলবে না। অন্যের মতো করে বুঝতে হবে। এর মতো কঠিন কাজ আর নেই। সর্ব ধর্মের একত্ব উপলব্ধি সর্ব ধর্ম সমন্বয়। সব ধর্মের প্রতি সমান অনুরাগও সর্ব ধর্ম সমন্বয় নয়। ওটা সমদর্শিতা বা সর্বমত সহিষ্ণুতা।

আর একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। ইংলণ্ড বিজয়ের পর বিজয়ী নর্মানরা ধীরে ধীরে ইংরেজ বনে যায়। চীন বিজয়ের পর মাঞ্চুরা ধীরে ধীরে চীনা বনে যায়। তেমনি হিন্দুস্থান বিজয়ের পর তুর্করা ও মোগলরা ধীরে ধীরে হিন্দুস্থান বা মুল্‌কি বনে যায়। প্রজাদের সবাইকে মুসলিম বানানোর অভিপ্রায় কারো কারো ছিল। কিন্তু সে অভিপ্রায় অচিরেই পরিত্যক্ত হয়। রাজপুতদের হাতে অস্ত্র ছিল। তারা অকুতোভয়। তাদের নারীরা পরাজয়ের পর অগ্নিপ্রবেশ করত। তারা স্বধর্মরক্ষা করতে সর্বদা প্রস্তুত। তা ছাড়া অন্যায় হস্তক্ষেপ সইতে না পারলে এক রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্য রাজ্যে শরণ নেবার পথ-ঘাট খোলা ছিল। তেমন রাজ্যও ছিল। তাই হাজার বছরেও সব হিন্দু মুসলমান হয়নি। কয়েকটি অঞ্চল বাদ দিলে অন্যত্র হিন্দু সংখ্যাই বেশী। ধর্ম অনুসারে দেশভাগ ইসলামের গতিরোধ করেছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে বিভক্ত করে ভারত রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায়কে হীনবল করেছে। পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকরা যত কিছু প্রত্যাশা করে তত কিছু জোগানোর ক্ষমতা ভারতরাষ্ট্রের তুলনায় সেসব রাষ্ট্রের কম।

আরো একটা কথা। ইসলাম আর আরব, পারস্য, আফগানিস্থান ইত্যাদি দেশ এক জিনিস নয়। আরব দেশের লোক মুসলমান হবার পূর্বেই ভারতীয়দের সঙ্গে বাণিজ্য করত ও সেইসূত্রে সংস্কৃতি বিনিময় করত। অষ্টম শতাব্দীতে মুহম্মদ বিন কাসিম যখন সিন্ধুপ্রদেশ জয় করেন তখন সিন্ধু আর হিন্দের মাঝখান দিয়ে হাকরা বলে একটি নদী ছিল। হিন্দের রাজারা সিন্ধু নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। সিন্ধের আরব

বিজেতারাও হাকরা নদীর সীমান্ত অতিক্রম করতে চেষ্টা করেননি। কয়েক শতাব্দী এইরূপ সহ-অবস্থানেই কেটে যায়। আরব বা ইরান থেকে আর কেউ আক্রমণ করেন না। আক্রমণটা আসে আফগানিস্থানের দিক থেকে। সেকালে আফগানিস্থান ছিল ভারতেরই অঙ্গ। অধিবাসীরা হিন্দু বা বৌদ্ধ। যেমন কাশ্মীরের অধিবাসীরা। নামও তখন আফগানিস্থান ছিল না। গান্ধার প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ছিল বিভিন্ন অংশের। ধর্মান্তর গ্রহণ এক শতাব্দীর ব্যাপার ছিল না। ছিল বহু শতাব্দীর ব্যাপার। এতকাল পরেও সে দেশে এখনো কিছু হিন্দু অবশিষ্ট আছে। তারা বাইরে থেকে যায় নি। সেখানকারই লোক। সে রকম এক হিন্দুর সঙ্গে আমার রেলপথে আলাপ। আফগান আক্রমণ ঠিক বিদেশী আক্রমণ ছিল না। ঠিক বিধর্মী আক্রমণও নয়। সুলতান মাহমুদের একজন হিন্দু সেনাপতি ছিলেন শুনেছি। রাজায় রাজায় যুদ্ধ। মন্দির ধ্বংসটা মণি মাণিক্য স্বর্ণ রজতের লোভে। মন্দিরে এসব সুরক্ষিত হতো। মন্দিরের আয়ও ছিল রাজদরবারের মতো। ইউরোপে খ্রীষ্টানরা ধ্বংস করেছে পেগানদের মন্দির, মুসলমানরা খ্রীষ্টানদের গির্জা, প্রটেসটাণ্টরা ক্যাথলিকদের মঠবাড়ী। হিন্দু রাজারাও যে অপর হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ধ্বংস করেননি তা নয়। দাক্ষিণ ভারতে এর দৃষ্টান্ত মেলে। ধর্মস্থানকে ধ্বংস করে ধর্মকে ধ্বংস করা যায় না। রুশ ও চীনা বিপ্লবীরাও এটা শিক্ষা করেছেন।

হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে তিক্ত করে রাজ্য অধিকার করার পর ধর্মে সরকারী হস্তক্ষেপ। বাবর হুমায়ুনকে নির্দেশ দিয়ে যান হিন্দুদের ধর্মে হাত না দিতে। তিনি ও তাঁর পুত্র আকবর এ নির্দেশ মান্য করে চলেন। নইলে মোগল সাম্রাজ্য হিন্দুদের হৃদয় জয় করতে পারত না। ইংরেজরা গোড়া থেকেই ঘোষণা করে দেয় যে হিন্দু বা মুসলমান কারো ধর্মেই হস্তক্ষেপ করবে না। তাদের এই উদার নীতিও প্রজাদের হৃদয় জয় করে। আফগান বা তুর্করাও বহু ক্ষেত্রে সমদর্শী ছিলেন। যেমন গৌড়ের সুলতানরা।

রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা মধ্যযুগের রাজা রাজড়াদের রীতি ছিল সবদেশেই। ভারতই একমাত্র দেশে নয়। মুসলিম রাজারাও একমাত্র রাজা নন। ইংরেজদের আগমন মধ্যযুগের পরবর্তী যুগে।

ইতিমধ্যে ধর্মের থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করার পর্ব শুরু হয়ে গেছে। মানুষ আর নিজেকে ক্যাথলিক বা প্রটেসটাণ্ট বলে ভাবতে রাজী নয়। ভাবছে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান বলে। এদিক থেকে অগ্রণী ছিল ইংরেজ ও ফরাসীরা। পশ্চাৎপদ ছিল স্প্যানিশ আর পর্টুগীজরা। গোয়ার পর্টুগীজ শাসকরা নির্মমভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালায়। তুলনায় ইংরেজরাই যে উদারতর এটা সকলেই অনুভব করে। ফরাসীরাও সমান আস্থা পায়।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ধর্মঘটিত নয়, অর্থনীতিঘটিত। ওরা যদি তুর্ক বা মোগলদের মতো ভারতে থেকে যেত ও ভারতের শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির যাতে ক্ষতি না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখত তা হলে তাদের শাসন তেমন দুর্বহ হতো না। কিন্তু শোষণ করতে করতে সমৃদ্ধ ভারতকে তারা নিঃস্ব করে। সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত্র ও দুর্বল করে। যেটা তুর্ক বা মোগলরাও করেনি। মোগলরা বহু হিন্দুকে মনসবদারী দেয়, মানসিংহ প্রভৃতিকে সেনাপতি করে। উচ্চতর অসামরিক পদগুলিকে চার ভাগ করে দু'ভাগ দেয় বহিরাগত মুসলমানদের, একভাগ মুলুকি মুসলমান-দের ও একভাগ হিন্দুদের। ফলে মুলুকি মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের মিলন হয়। বহিরাগতরা ইংরেজদেরই মতো ধন সঞ্চয় করে স্বদেশে পাড়ি দিতেন। অসাধুভাবে অর্জিত সন্দেহে তাঁদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হল। হিন্দু জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে মুসলিম জমিদার শ্রেণীরও মিলন ছিল। হিন্দু বণিক শ্রেণীর সঙ্গে মুসলিম বণিক শ্রেণীরও। ধর্ম নিয়েও এঁদের মধ্যে, একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়। "তুমিও ভালো, আমিও ভালো।"

গো-হত্যা, মসজিদের সামনে বাজনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আপস তখনো হয়নি এখনো হচ্ছে না। এই রকম কয়েকটি বিষয় বাদ দিলে আপসের মনোভাব দুই পক্ষেই বজায় ছিল। মহরম ও হোলি হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলেরই উৎসব। মহরম একপ্রকার উৎসবেই পরিণত হয়েছিল। নতুবা হিন্দুরাও লাঠি খেলত না, বাঘ নাচত না। আমার ঠাকু'মার মানত ছিল আমি লাঠি খেলব। আর আমার শখ ছিল আমিও বাঘ নাচব। কোনোটাই সম্ভব হয়নি। আমাদের পরিবারে গোঁড়ামি যথেষ্ট থাকলেও আমরা বোখারী সাহেবের দেওয়া সিন্নী ও আতাহারঁ মিঞার

হালুয়া ফুর্তি করে খেয়েছি। আমাদের পেছনের বাড়ীতেই থাকতেন একঘর ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। 'পাঠান মাস্টার'তো আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন। কাকাদের বন্ধু বলে আমরা তাঁকে কাকা বলতুম। আমার সব চেয়ে পুরনো ফোটো তো তাঁর পাশে বসেই তোলা। ধুতী পাঞ্জাবী পরা, চাদর গলায়, ফোটোতে এই তাঁর বেশভূষা। ওড়িশায় সব মুসলমানকেই পাঠান বলা হতো। কারা হিন্দু, কারা তুরুক, কারা মোগল, কারা পাঠান, এটাই ছিল মধ্যযুগের গণনা। সাহিত্যে এর যথেষ্ট উদাহরণ। পরবর্তীকালে জাতি অনুসারে পরিচয় না দিয়ে সম্প্রদায় অনুসারে পরিচয় দেওয়া শুরু হয়। এক বাঙালী মুসলিম অধ্যাপকের মতে মুসলিম শাসনের প্রথম তিনশো বছর হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের সংস্কৃতি অভিন্ন ভারতীয় সংস্কৃতি ছিল। তিনি দুঃখ করে বলেন, "বিচ্ছেদের সূত্রপাত ষোড়শ শতাব্দী থেকে। পরিণতি দেশভাগ ও প্রদেশভাগ।"

শেষকথা, হিন্দুরা ইসলাম কবুল করেনি, কিন্তু পারসিক সংস্কৃতিকে স্বাগত জানিয়েছে। পারসিক ভাষা সংস্কৃতের সোদর। পারসিকরাও আর্যভাষী। এখনো বহু হিন্দু পরিবারে ফারসী ভাষার আদর। ছেলেরা স্কুলে ফারসী পড়ে।

অন্নদাশংকর রায়

আমাদের কথা

স্বাধীনতাপূর্ব অবিভক্ত বাংলায় মৌলবী রেজাউল করীম তৎকালীন বিদগ্ধমহলে একটি অতি পরিচিত নাম। আজীবন গান্ধীবাদী, স্বাধীনতা সংগ্রামী করীম সাহেবের লেখা কিছু প্রবন্ধ সে সময় বিভিন্ন মহলে যে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল তা প্রবীণ ও প্রাচীন অনেকের স্মরণ থাকবার কথা। তিনি অনেক লিখেছেন। তাঁর কিছু লেখা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়।

বীরভূমে জন্মস্থান হলেও ১৯২৪ সালের পর থেকে করীম সাহেবের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ছিল নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায়, তাই দেশভাগের পর তিনি তাঁর যৌবনের স্মৃতিবিজড়িত বহরমপুরকে কর্মকেন্দ্র হিসাবে বেছে নেন। তিনি সসম্মানে বহরমপুর গার্লস কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপনায় বৃত হন। তার সাথে তাঁর সাহিত্য চর্চাও চলতে থাকে, আজও অব্যাহত। মূলতঃ তিনি প্রবন্ধকার। তাঁর প্রত্যেকটি লেখার প্রতিপাদ্য বিষয় দেশের ঐক্য, সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংস্কৃতি সমন্বয়। দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণের দ্বারা সকল মানুষের সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলবার এক বলিষ্ঠ প্রয়াস। ঐ প্রবন্ধগুলি বাংলার মূল্যবান সম্পদ।

অতি অল্পে সন্তুষ্ট, সরল জীবনযাপনকারী, বিনয়ী করীম সাহেব বৈদিকযুগের আচার্যতুল্য আদর্শ শিক্ষাব্রতী। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী তাঁর বাড়িতে তাঁর কাছে নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করে অনেকেই আজ তাঁদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এর জন্য তিনি কারও কাছে কখনও এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নি। আজকের এই আত্মকেন্দ্রিক বস্তুবাদী সমাজে করীম সাহেব এক দুর্লভ চরিত্র। এই ঋষিতুল্য অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মানুষটি নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত অসাবধান। তাঁর বইপত্র, লেখাপড়া করবার সাজ-সরঞ্জাম সমস্ত কিছুই অগোছাল। সুতরাং তাঁর দীর্ঘদিন পূর্বের যে সমস্ত রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইংরেজী ও বাংলায় অতি সমাদরে মুদ্রিত

হয়েছিল তা আজ তাঁর নিজেরই অনাদরে ও অসাবধানতায় তাঁর নিজের ভান্ডারে অমিল। তাঁর বর্তমান বয়স ৮১ বৎসর। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেলেও স্মৃতিশক্তি প্রখর। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর নাম পর্যন্ত তিনি বিস্মৃত হন নি।

অখিল ভারত চরখা সংঘের সময় থেকে খাদির কাজের সাথে নিযুক্ত থেকে আজ আমরা পশ্চিমবাংলায় তথা ভারতবর্ষের খাদি গ্রামোদ্যোগ আন্দোলনের তথা গঠনকর্মের সাথে যুক্ত কর্মী ও প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট সুপরিচিত। শ্রদ্ধেয় করীম সাহেব আমাদের এই খাদি প্রতিষ্ঠানে একজন সম্মানীয় পরিচালক সদস্য হিসাবে দীর্ঘদিন যুক্ত। আমাদের সমিতি তার জন্য গর্বিত। আমরা তাঁর সমস্ত রচনা পড়বার সুযোগ না পেলেও যেটুকু পড়বার সুযোগ পেয়েছি তাতে অনুভব করেছি যে এই স্বাধীনোত্তর ভারতে আজও তার প্রয়োজন আছে এবং হয়ত বা কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন করে তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমরা তাই আমাদের সমিতির এই প্রজ্ঞাচক্ষু প্রবীণ সদস্যের বাংলা রচনাসমূহ যতদূর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাকে একত্রিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হয়েছি। এই বইটি তার প্রথম ফল।

শ্রদ্ধেয় করীম সাহেবের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র সাহিত্যের অধ্যাপক আবুল হাসানাৎ সাহেব অতি কষ্ট করে আমাদের অনুরোধে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত রচনাগুলো বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন এবং আমাদেরই অনুরোধে বইটি সম্পাদনা করার শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর কাছে আমরা চিরঋণী। আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। যার ফলে পুস্তক প্রকাশনের ক্ষেত্রে আজকাল নানাকারণে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে থাকলেও মনে হয় আমাদের উদ্যোগে মুদ্রিত এই রচনাসম্ভারের মূল্য সে তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হবে। গান্ধী-বিনোবার আদর্শানুসারী করীমসাহেবের প্রতি আমাদের অকপট শ্রদ্ধা জানাবার এ সুযোগ আমরা সানন্দে গ্রহণ করেছি। এই পুস্তকের বিক্রয়জনিত লাভালাভের সাথে সমিতির কোন স্বার্থ জড়িত নাই।

৩০/১ বি কলেজ রোতে অবস্থিত 'বুক ট্রাষ্টের' স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বরুণ গাঙ্গুলী এই বইটি প্রকাশনার ভার নিয়ে আমাদেরকে দায়মুক্ত

করেছেন। তার জন্য তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। আমাদের সমিতির অন্যতম পরিচালক সদস্য শ্রীযুক্ত শশাঙ্কভূষণ চৌধুরী এই পুস্তক প্রকাশের জন্য অক্লেশে যে শ্রম স্বীকার করেছেন এবং প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমাদের অপর বন্ধু দত্ত লাইনোটোনের শ্রী আশুতোষ দত্ত মশাই এর অবদান এখানে স্মরণীয়।

প্রকাশিত বইটি পাঠকদের ভাল লাগলে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি সার্থক হবে এবং প্রকাশিত অপ্রকাশিত আরও কিছু প্রবন্ধ সংগ্রহ দ্বিতীয়খণ্ডে প্রকাশে আমাদেরকে উৎসাহিত করবে।

লেখকের কথা

দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধ'রে আমার কিছু প্রবন্ধ বাংলা ভাষার নানা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদের) চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম খাদি সমিতির শ্রীনন্দ চৌধুরী ও শ্রীশশাংক চৌধুরী মহাশয় আমার সেই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের যে আয়োজন করেছেন, তার জন্য জীবনের শেষ পাদে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতি অন্তরের গভীর প্রীতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। সারা জীবন সংস্কৃতি সমন্বয়ের জন্য প্রাণপণ সাধনা করেছি, এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছি। সেই ভাবনার স্বাক্ষর প্রকাশ লাভ করায় এই রচনা-সংকলন আমাকে গভীর আনন্দ ও পরম সন্তোষ প্রদান করেছে। এই প্রসঙ্গে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আমার অগ্রজ মরহুম মঈনুদ্দিন হোসায়ন সাহেবকে যিনি নানাভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান ক'রে আমার মানসিক বিকাশে সহায়তা করেছিলেন। প্রখ্যাত মণীষী সংস্কৃতিসেবক শ্রীঅন্নদাশংকর রায় মহাশয় এই গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে গভীর ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। প্রকাশক শ্রীবরুণ গাঙ্গুলী মহাশয়কেও তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। সবশেষে এই প্রকাশনার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের মনে সমন্বয় ভাবনার উদ্বোধন ঘটুক, এই কামনা করি।

গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ — রেজাউল করীম

সম্পাদকের কথা

আধুনিক বাংলা মননশীল সাহিত্যে মানবতাবাদী চিন্তানায়ক মনীষী রেজাউল করীমের অবদানের প্রতি একালের অবগুণ্ঠিত স্বীকৃতির বিচ্ছিন্ন প্রয়াস আমাদের আহত করে। তিনি আজ ভারতীয় — বিশেষ ক'রে বাঙালী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সমন্বয় ভাবনার আদর্শ হিসাবে বন্দিত হওয়ার অধিকারী। কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনার প্রতি আধুনিক (ভারতের স্বাধীনোত্তর পর্বে) পাঠক-সম্প্রদায়ের খণ্ডিত, ক্ষীণজীবী অনুসন্ধিৎসা তাঁকে একালের ভাবজগতে প্রায় পঙক্তিহীন করে তুলেছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের অনেকগুলি রচনামুহূর্তের বিচিত্র দায়িত্ব পালনের পর যে অপরিচিতির মাঝে ধূলিমলিন হয়ে রইল, তার মূল দায়িত্ব আমাদেরই। এই কথা মনে রেখেই আমরা, তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনা ছাড়া যে সব অসংখ্য মূল্যবান রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি সংকলিত করে দুই খণ্ডে পাঠকসম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থাপিত করবার প্রয়াস লাভ করেছি। বর্তমান খণ্ডটি তারই প্রথম পদক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, তাঁর সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক যেসব প্রবন্ধ সংস্কৃতি সমন্বয়ের ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত, এবং যে সব ভাবনায় সমাজ-দার্শনিক গুরুত্ব বিদ্যমান, সেগুলিই আমরা বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। এই প্রবন্ধগুলির পরিচয় দান করবার পূর্বে রেজাউল করীমের ভাবজগত এবং সংস্কৃতি সমন্বয়ের ষে-স্থানে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে আসীন সেই সমন্বয়-ভাবনার ধারা সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র আলোচনার দ্বারা তার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ভারতে মুসলিম শাসনের বহু পূর্ব হতেই মুসলিমগণ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য এবং সংস্কৃতির চর্চা করতেন। অনুবাদ গ্রন্থ তো বটেই, তাছাড়া হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষায় পৃথক মৌলিক গ্রন্থ মুসলিমদের দ্বারা রচিত হয়েছিল, একথা পণ্ডিত সমাজ স্বীকার করেন। ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই সংস্কৃতি-

বিনিময়ের কাজ আরো বিস্তৃত হয়। পাঠান ও মুঘল সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা এবং সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রচেষ্টা একটা গুরুত্বপূর্ণ আয়তন লাভ করে। সে-যুগে (এবং তার পরেও দীর্ঘদিন ধরে) ভারতে বসবাসকারী মুসলিমগণ কিভাবে এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকে ফলবতী করেছেন, তার ইতিহাস চমকপ্রদ। এ বিষয়ে সর্বাগ্রে যাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যায়, তিনি আমীর খুসরু। তিনি মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় ও ফারসী সাহিত্যের মিলন-ইতিহাসে তিনি একটি স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তিনি ফারসী ছাড়াও দুটি ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন—উর্দু ও হিন্দী—যার জন্য মধ্যযুগের ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যে এবং সংস্কৃতি সমন্বয়ের ইতিহাসে সমন্বয়ের সাধক হিসাবে তিনি আজও আমাদের নিকট অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস।

মধ্যযুগে আরও কিছু মুসলিম কবি সাহিত্যিক এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন (এক্ষেত্রে রামানন্দ, নানক, একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি অমুসলিম সাধকের কথাও স্মরণীয়) ঃ কবীর, দাউদজী (দাদু), রজ্জবজী, কুতুবন, মালিক মুহম্মদ জায়সী, মংঝন, আব্দুর রহীম খান খানান, অম্বর হুসেন প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যেও এই ধারাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে লালন ও রক্ষা করেছিলেন এমন কিছু ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করা আমাদের সাংস্কৃতিক দায়িত্ব। সাবিরিদ খাঁ, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মুহম্মদ আকবর, দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল, এবং বিশেষভাবে পদাবলী সাহিত্যে সৈয়দ আইনুদ্দিন, গেয়াস খান, গরীব খান, ফতে খান, আফজল আলী, শেখ চান্দ, সাদেক আলী, শেখ মুহম্মদ হোসেন, সৈয়দ মর্তুজা, নাসির মামুদ, আলী রাজা—এঁরা সকলেই সংস্কৃতি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

কিন্তু এ নদী "মরুপথে হারাল ধারা"। ভারতে মুসলিম শাসনের অবসানে ফারসী ও উর্দু রাজানুগ্রহ হারানোর ফলে তাদের গুরুত্ব গেল কমে, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে এল বহু পরিবর্তন; আর তার ফলে চিন্তা ও ভাবের জগতে নতুন নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি হল। কিন্তু মুসলিম সমাজ এই পরিবর্তকে মেনে নিয়ে নতুন পথে পরিচালিত চিন্তাধারাকে

অভ্যর্থনা করতে পারলেন না। (অবশ্য এ বিষয়ে আরো কিছু শক্তিও দায়ী ছিল ; যথা, তাঁদেরকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মধারায় অনুদার দূরত্বে পশ্চাদবর্তী রাখার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানসিকতা)। তাই ফারসী-উর্দুর অন্ধ অনুসরণই তাঁদের ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়তঃ ওহাবী প্রভাব তাঁদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করল। সেই কারণে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণ (এটা আধুনিককালের পুনর্বিচারে হিন্দুত্বের পুনরুত্থান নামে পরিচিত এবং তার অন্তর্নিহিত সত্যের কথা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন) নামে ভারতের, বিশেষ করে বাংলার সংস্কৃতি-জগতে যে নবত্বের সূচনা হয়েছিল, মুসলিমগণ, (বিশেষ করে বাঙালী মুসলিমগণ) সাধারণভাবে তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারলেন না।

প্রথম যে বাঙালী মুসলিম এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সৃষ্টি করলেন, তিনি মীর মশারফ হোসেন। তিনি ছিলেন উদার এবং সংস্কারমুক্ত গণচেতনার ইতিহাসে প্রথম সার্থক বাঙালী মুসলিমের প্রতিনিধি। সংস্কারমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারায় নিজে সঞ্জীবিত হয়ে অপরকে উদ্বোধিত করার চেষ্টা আর যে কয়জন মুসলমান চিন্তাশীল লেখক করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এস ওয়াজেদ আলী, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আব্দুল ওদুদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, অধ্যাপক আবুল হোসেন সহ "শিখা" পত্রিকাগোষ্ঠীর কিছু সাহিত্যিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক রেজাউল করীম এই ধারারই সার্থক রূপকার। এঁরা প্রত্যেকেই যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন এবং যে-যুগের চিন্তাধারায় পুষ্ট হন সেটা ছিল রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংঘাত ও সংকটের যুগ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষময় আঘাতে, মুসলীম লীগ ও হিন্দু মহাসভার অসংস্কৃত বীরত্বে বিপর্যস্ত মুসলমানের সম্মুখে তখন অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। কিন্তু এঁরা সবলে এই সংশয়কে কাটিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উদার মুক্ত-বুদ্ধির উদ্বোধন ঘটালেন। এ জন্য এঁদেরকে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সম্মুখীন হতে হয়েছে। একদিকে নিজ সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অনুদার যুক্তিহীনদের কাছে এঁরা স্বধর্মচ্যুত বলে বিবেচিত, অপরদিকে বড় সম্প্রদায়ের অনেকের কাছেই এঁদের আসল গুরুত্ব এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে এঁদের যথার্থ তাৎপর্য বিস্ময়করভাবে অনুপলব্ধ।

অধ্যাপক রেজাউল করীম সেইরূপ এক বিরল ব্যক্তিত্ব, বাংলা তথা ভারতের সংহতি ও সমন্বয়ের ইতিহাসে যাঁর নেতৃত্বকে আমরা বিস্মৃত হয়েছি।

বাংলার রাজনৈতিক ও সাহিত্যের ইতিহাসে রেজাউল করীমের অনাড়ম্বর আবির্ভাব নানাদিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যখন প্রথম রাজনীতি ও সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন, (বর্তমান শতকের প্রথম পাদে) তখন ভারতের ঘোর দুর্দিন। একে তো পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশবাসী মুক্ত নয়; তার উপর নানা জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় মানুষের মন বিচলিত, উদ্‌ভ্রান্ত। বিশেষতঃ, সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা তীব্র আকার ধারণ করেছে তখন; পরাধীন ও পথভ্রষ্ট হিন্দু-মুসলমানের কাছে না ছিল কোন দ্বিধাহীন পথ, না ছিল সেই পথ দেখাবার কোন স্পষ্ট আলোক। এই সময় সব্যসাচীর মত রেজাউল করীমের আগমন :—এক দিকে তিনি রাজনীতি ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে সঞ্চিত ধুম্রজাল অপসারিত করার চেষ্টা করেছেন, অপরদিকে যুক্তিবাদী মননের উদ্বোধন প্রচেষ্টায় সকল অন্ধ কুসংস্কার দূর করবার শিল্প-কর্মে ব্রতী হয়েছেন। প্রাক-স্বাধীনতা-যুগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তাঁর কর্ম, দেশপ্রেম, ত্যাগ, উদার যুক্তিনির্ভর মানসিকতা, চিন্তাশীল এবং স্থির বলিষ্ঠ লেখনী তাঁকে একটি বিশিষ্ট আসন দান করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বহু গ্রন্থে তাঁর এই পরিচ্ছন্ন পরিশীলিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর "নয়াভারতের ভিত্তির" রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির অন্তর্নিহিত উদারতা এবং লেখনী শক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে স্বাগত জানিয়ে এক পত্র লিখেছিলেন উত্তরপ্রদেশের আলমোড়া থেকে। (১৮ই মে ১৯৩৭)। তাঁর ছাত্রাবস্থায় (কৃষ্ণনাথ কলেজ) বহরমপুর হতে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত "সৌরভ" এবং পরবর্তীকালে সম্পাদিত জাতীয়তাবাদী দৈনিক "দূরবীণের" মধ্যেও এই উদার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের আদর্শ ও বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

রেজাউল করীম তাঁর "For India and Islam" গ্রন্থের টাইটেল্ পৃষ্ঠায় তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা মওলানা মহম্মদ আলী রাউণ্ড টেব্‌ল্ কনফারেন্সে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেইটি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রেজাউল করীমের নিজের আদর্শের কথা প্রকাশ লাভ করায় সেই আবেগ

উত্তপ্ত লাইনগুলি স্মরণ করি ঃ "Where India is concerned, where India's freedom is concerned, where the welfare of India is concerned, I am an Indian first, an Indian second, and Indian last, and nothing but an Indian." সত্যই রেজাউল করীমও "nothing but an Indian." প্রচলিত ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কোন সময়েই তাঁর দেশাত্মবোধের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। হজরত মহম্মদের (শান্তি) একটি বিখ্যাত বাণী ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ঃ— "হুব্বুল ওয়াতান মিনাল ঈমান"—স্বদেশপ্রেম ঈমানের (ধর্মীয় বিশ্বাসের) অঙ্গ। এই মন্ত্রে শক্তিশালী রেজাউল করীম বিভিন্ন রচনায় নিবেদিত সাধকের নিষ্ঠা ও স্থিরতা নিয়ে স্বদেশ-পূজা করেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর স্বদেশ-কল্পনায় ভাবাবেগপূর্ণ ধর্মীয় মাতৃ-আরোপণ ছিল না। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত রেজাউল করীমের স্বদেশ ও জাতীয়তার ধারণা ছিল একান্তভাবে আধুনিক। তিনি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার অনেক উর্ধ্বে। তিনি ধর্মীয় কুসংস্কার ও তার অন্তসারশূন্যতার কথা ঘোষণা করে সাম্প্রদায়িকতা থেকে জাতীয়তার পথে ভ্রান্ত হিন্দু-মুসলিমদের (বিশেষ করে মুসলিমদের) আহ্বান করেছেন। তিনি ইসলামিক কনফেডারেশনের ভ্রান্তির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলেছেন, "World federation is possible on political and economic lines, but to found it on religious lines is highly retrograde; because religious differences count little in the face of the currents and cross currents of political degeneration and economic depression." ("for India and Islam"). আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, যখন দেশে বহু মুসলিমের মনে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জড়তা, দ্বিধা ও গোঁড়ামী রাজত্ব করছিল, সে-সময় রেজাউল করীমের এই আলোকিত আত্মার বাণী ভবিষ্যদ্বাণীর মতই প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ। এই পুস্তকের আর একটি প্রবন্ধ "An Open Letter to Dr. Sir Iqbal" একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ রচনা। কবি ইকবাল তাঁর হৃদয়ের কবি সুলভ উদারতা, কল্পনা ও গভীর সার্বজনীনতাকে (রেজাউল করীম তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধে ইকবালের এই গুণের গভীর প্রশংসা করেছেন) ত্যাগ

করে, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে কিভাবে কবি-ধর্মচ্যুত হলেন, তারই অপূর্ব আবেগমণ্ডিত চিত্র এই প্রবন্ধটি। কবি-সাহিত্যিকের কী মানবীয় বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, এবং কিভাবে তাঁদের দ্বারা সংস্কৃতি সমন্বয় সম্ভব হয়, তার ইঙ্গিত রয়েছে এই প্রবন্ধে। এই উদার, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজ ও ইতিহাস-সচেতন মন (তিনি পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞানী টমাস পেনের "দি রাইট্স্ অফ ম্যান" ও "দি এজ অফ রিজন্" এবং লেকীর "দি রাইজ এণ্ড ইনফ্লুয়েন্স অফ র‍্যাশনালিজম ইন ইউরোপের" ভক্ত পাঠক ছিলেন) রেজাউল করীমকে এ দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান প্রদান করেছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক কলহে লেখক ও চিন্তাশীল হিসাবে তাঁর ভূমিকা নির্বাচনের এই দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃতি-সমন্বয়ে অনুপ্রাণিত করেছে।

"বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ" গ্রন্থে বঙ্কিমের প্রতি বিশুদ্ধ সাহিত্য-প্রীতিজাত এক-ধরণের অতিরঞ্জিত শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেলেও সাম্প্রদায়িকতার সেই প্রমত্ত কলহ-তরঙ্গের যুগে অধ্যাপক রেজাউল করীম এই গ্রন্থে তার আঘাতকে ধীরভাবে প্রতিহত করবার চেষ্টা করেছেন। (তবে, আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীদের অনেকের মতে, "আনন্দমঠ" ও বঙ্কিমচন্দ্রের আরো কিছু রচনা একদিকে মুসলিম সেন্টিমেন্ট, অপরদিকে অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়বাদী মানস-প্রক্রিয়াকে ক্ষুন্ন করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না।) রেজাউল করীম এই শুভবুদ্ধির প্রার্থনা করেছিলেন যে "আনন্দমঠের" ধর্মীয় ধুম্রজাল ভেদ করে তার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন মুসলিমরা করতে শিখুন। তাঁর এই দায়িত্ব ছিল ইতিহাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে একথা বললে বোধ হয় ঐতিহাসিক ভ্রান্তি হবে না যে তাঁর সহজাত সরলতা ও সাংস্কৃতিক সততার ফলে অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছ চিন্তাধারার কিছু তদানীন্তন বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমের কিছু একদেশদর্শী ভাবনাকে পরিচ্ছন্ন আদর্শ হিসাবে সমর্থন করা ও অনু-মোদন করিয়ে নেবার অনুদার উদ্দীপনা প্রকাশ করেছিলেন। তবু স্বীকার করতেই হবে, লীগ-নিয়ন্ত্রিত মানসিকতার যুগে এই গ্রন্থে তাঁর চিন্তাধারার অসংকোচ প্রকাশ শুধু নির্ভীকই নয়, ঐতিহাসিক মহত্বে মণ্ডিত।

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের পূজারী রেজাউল করীম আজীবন এই সমন্বয়ের কাজ করেছেন; আপনার জীবন ও আদর্শের সঙ্গে এই সমন্বয়ের স্পিরিটকে বিধৃত

করে নিয়েছেন। তাঁর বহু বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও পুস্তকে এই মানসিকতার অপূর্ব নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। তাঁর বহু প্রবন্ধ বা গ্রন্থের বিষয়বস্তু নির্বাচনের কথা এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। তিনি লিখেছেন, "সংস্কৃত-চর্চায় মুসলমান", "ফারসী-চর্চায় হিন্দু সুধী", ভারতে ধর্মসমন্বয়ের কথা, "ভারত আরব সম্পর্কের গোড়ার কথা"। এইসব প্রবন্ধ ছাড়াও নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতেও এই সমন্বয়বাদী মনই ক্রিয়াশীল—"বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ" "For India and Islam", "মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ", "তুর্কীবীর কামাল-পাশা", "ফরাসী-বিপ্লব", "জাগৃহি"র সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধগুলি "সাধক দারা শিকোহ"—যার শেষ প্রবন্ধ "সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত আলবেরুনী" বাংলা মননশীল প্রবন্ধ-শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। বিষয়বস্তু নির্বাচনে একটি সচেতন সমন্বয়-প্রচেষ্টা কারো দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। এর পশ্চাতে যে ঐতিহাসিক কারণ কাজ করছিল, তা হল এই ঃ বাংলা, তথা ভারতের আকাশ রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ধূমাঙ্কিত ; আর তার ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও একটি অনুদার বিচ্ছিন্নতা উভয় সমাজকে গ্রাস করেছিল। রেজাউল করীম সচেতনভাবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মিলনের দ্বারা জাতীয় ঐক্যের উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। দেশ যখন বহিঃশত্রুর রুদ্রতা এবং অন্তঃশক্তির পশুত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন, তখন রেজাউল করীম এই সব রচনার মাধ্যমে দুই সম্প্রদায়ের মনোজগতকে মিলিত রাখতে চেয়েছিলেন।

সেই কারণে তিনি একজন মহান ভারতীয়ের—সাধক দারা শিকোহের—জীবন ও আদর্শকে আলোচনার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। দারা শিকোহ সত্যিই ছিলেন ভারতীয় ; এই ভারতীয়তা—চিন্তায় ও বিশ্বাসে—তাঁর চরিত্রকে বিশেষত্ব ও মহত্ব দান করেছিল। ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায়কে প্রথম আধুনিক পুরুষ বলা হয়ে থাকে ; কিন্তু এই আধুনিক মনের পরিচয় তাঁর বহুদিন পূর্বে ভারতীয় রাজপুত্র দারা শিকোহের মধ্যে আমরা লাভ করি। তাঁর মহান গ্রন্থ "মাজমা-উল-বাহরায়েন" (দুই সমুদ্রের মিলন) সচেতন সংস্কৃতি সমন্বয়-প্রচেষ্টার পরিচয়-হিসাবে ভারতের চিন্তা-জগতে চিরকাল অঙ্কিত থাকবে। এই কারণেই অধ্যাপক রেজাউল করীম তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং "সাধক দারা শিকোহ"

রচনায় উৎসাহিত হন। উভয় চিন্তানায়কের ভাবনার এই সাদৃশ্য তাঁদের নিজ নিজ পরিবেশের তাৎক্ষণিক-সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে সমন্বয়ের প্রবহমানতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন।

বর্তমান গ্রন্থটি রেজাউল করীমের সমন্বয় ভাবনায় সম্পৃক্ত প্রবন্ধের সমষ্টি। সমস্ত রচনার মধ্যেই এই মিলন ও সমন্বয়ের সুরের ধারা প্রবাহিত। এ-সম্পর্কে তাঁর ভাবনাগুলি নতুন করে চিন্তা করা প্রয়োজন। "সংস্কৃতি-সমন্বয় কিছু ভাবনা" এই নামকরণের মধ্য দিয়ে এই ভাবনার আয়োজন করা হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম রচনা "ভারতে ধর্মসমন্বয় ও রামকৃষ্ণ পরমহংস"। মধ্যযুগে ভারতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সুফী ও সাধকগণ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর মানবতার জয়গান গেয়েছিলেন। তাঁদেরই ধারার আধুনিক উত্তরসূরী রামকৃষ্ণ। এই প্রবন্ধে রামকৃষ্ণের মিলন আদর্শের পূর্ণ আলোচনা উপস্থাপিত করা হয়নি; শুধু দেখানো হয়েছে, সমন্বয়-ভাবনার দীর্ঘ ঐতিহ্যের আধুনিক কালের সফল পরিণতি রামকৃষ্ণ।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ "ভারত-আরব সম্পর্কের গোড়ার কথা" ভারতবর্ষের সঙ্গে আরবের রাজনৈতিক যোগাযোগের বহু পূর্ব হতেই যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দীর্ঘদিন ধরেই প্রবহমান ছিল এবং ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এই যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল, তা দেখানো হয়েছে। প্রবন্ধের দুটি অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ: (১) "আব্বাসীয় খলিফাগণের সময় যেরূপ আগ্রহের সঙ্গে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা হত, ভারতে অপর দেশের ব্যাপার নিয়ে সেরূপ আলোচনা হত না। তা যদি হ'ত, তবে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ভারত বহু পূর্বে পৃথিবীর মিলন-কেন্দ্র হয়ে পড়ত।" উক্তিটি খুবই সত্য। ভারতের উন্নত মানসিক বৃত্তির বিকাশ সত্ত্বেও এই সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা যে তাকে "মিলন-কেন্দ্র" হতে দেয়নি, একথা ভারততত্ত্ববিদ আলবেরুণীও স্বীকার করেছেন। (২) "ভারতবর্ষ মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু তারা বিদেশী হয়ে থাকেননি। এ দেশের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে গেলেন। যদি ইউরোপীয় শক্তি ভারত প্রবেশের কোন পথ ও সুযোগ না পেত, তা হলে হয়ত শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানগণ একটা চূড়ান্ত বুঝাপড়া করে নিত।" এই কথাগুলির ইঙ্গিত

সুদূরপ্রসারী। সত্যই, ইউরোপীয় শক্তির ভারত-প্রবেশের পর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতার ফলে এই উভয় সম্প্রদায় অনেক দূরে সরে গেল। মধ্যযুগের সংস্কৃতি-বিনিময় তাই পরবর্তীকালে রুদ্ধ হ'ল।

"ভারতীয় মুসলমানের উপর হিন্দু প্রভাব"– ভারতবর্ষে ইসলাম আগমনের পর হিন্দু-ধর্মের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে যে ধর্মগত ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তন এসেছিল তারই বিশদ আলোচনা। লৌকিক স্তরে এই প্রভাবের ফলে লৌকিক ইসলামের জন্ম হ'ল। তবে এক্ষেত্রে এর বিপরীত ভাবনাটিও অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ-প্রসঙ্গে স্যার জন মার্শালের কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ : "Seldom in the history of mankind has the spectacle been witnessed of two civilisations, so vast and so strongly developed, yet so radically dissimilar as the Muhammedan and Hindu meeting and mingling together. The very contrast which existed between them, the wide divergences in their cultures and their religions, make the history of their impact peculiarly instructive." ভারতীয় হিন্দুর উপর মুসলমানের প্রভাব – শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির অন্যান্য বৃহৎ ক্ষেত্র (দ্রষ্টব্য : তারাচাঁদের "Influence of Islam on Indian Culture" এবং ড. দীনেশচন্দ্র সেনের "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান") ছাড়া দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রেও যে প্রযোজ্য সে-সম্পর্কে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "Iranianism" (10. ··· ··· Dialogues and Mutual Borrowings) এবং আমীর আলীর প্রবন্ধ "Islamic Culture in India" (Islamic Culture) দ্রষ্টব্য।

মহাগ্রন্থ কোরাণের অন্তর্নিহিত শক্তি ও মানব-কল্যাণের উপযোগী বাণী ও আদর্শের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বহু ভারতীয় ও অভারতীয় সুধী ব্যক্তি কোরাণের চর্চা করেছেন। যে সব অমুসলিম ভারতীয় কোরাণ চর্চায় মনোযোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ও মৌলানা ভাই গিরীশচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামমোহন কোরাণে তথা ইসলামে একেশ্বরের যে ধারণা পরিস্ফুট, তার দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর

"তুহফাতুল মুওয়াহহিদীন" (একেশ্বরবাদিগণের উপহার) এই চিন্তারই ফসল। ভাই গিরীশচন্দ্র কোরাণ ও হাদীসের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। গান্ধীজীও কোরাণের সারবস্তু অনুবাদের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। আচার্য বিনোবা ভাবেও কোরাণের মূল কথাগুলি (যা সকল ধর্মের মূল কথা) গ্রহণ করে "কোরাণ সার" প্রকাশ করেছিলেন। পাকিস্থানের বা যে-কোন দেশের উলেমা-সম্প্রদায় তাঁদের মধ্যে যাঁরা অনুদার ধর্ম-ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত এর বিরোধিতা করতে পারেন, বা কোরাণের উপর বিনোবা ভাবের অধিকারের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু ইসলামের সার্বজনীনতা তাঁদের ইসলাম-ব্যাখ্যা অপেক্ষা বিনোবা ভাবের "কোরাণ-সার" বা রামমোহনের "তুহফা" বা মওলানা জালালুদ্দীন রুমীর বিখ্যাত উক্তির (আমি কোরাণ হতে মজ্জা গ্রহণ করেছি এবং এর অস্থিগুলি চতুষ্পদের জন্য রেখে দিয়েছি) মধ্যেই যথার্থভাবে নিহিত রয়েছে।

"ফারসী-চর্চায় হিন্দু-সুধী"—ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে হিন্দু পণ্ডিত কবি, সাহিত্যিক যে ফারসীর চর্চা করে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি সম্ভব করেছিলেন, তারই বিশ্বস্ত দলিল। এক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুর কথা লেখক উল্লেখ করেন নি। রামমোহন রায় ফারসী ভাল জানতেন। ফারসী ভাষায় লিখিত ও মুদ্রিত পত্রিকা "মিরাতুল আখবার" তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। তাঁর "তুহফাতুল মুওয়াহহিদীন" ফারসী রচনা; এর ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ঠাকুর পরিবারের অনেকেই হাফিজের গজলসহ ফারসীর অনুরক্ত ছিলেন। মৌলানা ভাই গিরীশচন্দ্র সাদীও হাফিজের কিছু গজল বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। একথা অবশ্য অনেকখানি সত্য যে এই ফারসী চর্চার মূল কারণ—ফারসী ছিল রাজভাষা। ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর হিন্দু সুধীর এই ফারসী চর্চা তার ব্যাপকতা হারায়। ইংলণ্ডেও ব্যাপক ফারসী চর্চার মূলে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে (ভারত অথবা মধ্যপ্রাচ্যে) ভাল সরকারী চাকুরী লাভ। কিন্তু তার পরোক্ষ ফল ভালই হয়েছিল। বহু ফারসী (কিছু কিছু আরবীও) ক্লাসিক রচনা ইউরোপের (এবং ভারতেও) গোচরে এসেছিল। (লর্ড টেনিসন এবং এডওয়ার্ড ফিটজেরালডের মত বিশুদ্ধ ফারসী অনুশীলনকারীর কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।)

"দীনে এলাহি" প্রবন্ধে লেখক আকবরের সর্বধর্ম সমন্বয়মূলক ভাবনাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। একথা সত্য যে আকবরের "দীনে এলাহি" পরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। (অবশ্য, ঐতিহাসিক ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী এর বিরোধিতা করেছেন)। দারা শিকোহের সমন্বয়বাদী মানসিকতার সঙ্গে তুলনা করলেই এর বিশুদ্ধতার প্রকৃতি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা সম্ভব হবে। তবু ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে আলোচনা করেছেন—"সুল্‌হ্‌-ই-কুল"—বিশ্বজনের সহিত মৈত্রী—এই আদর্শ এত সচেতনভাবে বিশ্বের আর কোন সম্রাট তাঁর পূর্বে পরিকল্পিত করেন নি (দ্রষ্টব্য ঃ রেজাউল করীমের "সাধক দারা শিকোহ" গ্রন্থের ভূমিকা) সেটাও সত্য কথা। আকবরের নির্দেশে তাঁর মহান ঐক্যের বাণী আবুল ফজল কাশ্মীরের মন্দির গাত্রে খোদাই করেছিলেন। ব্লকম্যানকৃত তার ইংরাজী অনুবাদ ইংরাজ কবি টেনিসন তাঁর বিখ্যাত "Akbar's Dream" কবিতার ভূমিকাংশে উদ্ধৃত করেছেন। সমগ্র কবিতা এবং তার টীকাগুলি আকবরের "দীনে এলাহি"র ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

"মরমী লেখক দারা শিকোহ" রেজাউল করীমের দারা শিকোহের প্রতি গভীর আকর্ষণের আর একটি প্রমাণ। কিভাবে দারার উপনিষদ অনুবাদ ফরাসী পণ্ডিত আঁকেতিল দু পেরঁর মাধ্যমে ইউরোপে আনীত হয়েছিল, তার আলোচনা লেখক বর্তমান প্রবন্ধে করেছেন। দারার বিখ্যাত ফারসী গ্রন্থ "মাজমাউল বাহরায়েন"-এ আমরা উপলব্ধি করি, তিনি একদিকে যেমন ভারত ও আরব-পারস্যকে একস্থানে এনেছেন, তেমনি ইউরোপ ও ভারতকেও একস্থানে নিয়ে এসেছেন। এখানে একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী; (যা পহলবী ও ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং পরে আরবী অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপে নীত হয়েছিল) বা উপনিষদের গভীর চিন্তাসম্পদ—সংস্কৃত সাহিত্যের এই উভয় সৃষ্টি অসংস্কৃত-ভাষীদের দ্বারাই আরব বা ইউরোপে প্রচার লাভ করেছিল।

"সরমদ" রেজাউল করীমের একটি অসামান্য রচনা। এই অসামান্যতার মূল কারণ সরমদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। সরমদ ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে (দারার মত) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। সরমদের চিন্তাভাবনা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে আক্রমণ করলেও তার মধ্যে দূরপ্রসারী কল্পনা ও চিন্তার

মৌলিকতা ছিল। তাঁর চিন্তার সঙ্গে ওমর খৈয়ামের চিন্তার অনেকাংশের গভীর মিল রয়েছে। সরমদও অনেকগুলি সুন্দর রুবাই রচনা করেছিলেন ; চিন্তায়, ভাবে, প্রকাশভঙ্গীতে সেগুলি অপূর্ব। তবু সরমদ যে-অপরিচিত তার আসল কারণ, ফিট্‌জেরাল্‌ডের মত তাঁর কোন আধুনিক ব্যাখ্যাকার ছিলেন না। ঘাতকের হস্তে সরমদের মৃত্যু একজন সত্যসন্ধ সাধকের সৎ অনুসন্ধিৎসারই মৃত্যু। রেজাউল করীম এই প্রবন্ধের শেষে বলেছেন, "শহীদ সরমদ জিন্দাবাদ"—সরমদকে শহীদ আখ্যা দিয়ে তিনি তাঁর দুঃসাহসিক সত্যপ্রীতিকে স্বাগত ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

"সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে গান্ধীজীর দান" এ-ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অবদানের প্রতি একটি নম্র স্বীকৃতি। অবশ্য এ-বিষয়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বের কথা স্মরণ রেখেও কিছু ভাবনার প্রতি আমাদের মনোযোগী হতে হবে। হিন্দু-মুসলমান বিভেদের জন্য শুধুমাত্র বিট্রিশদের দায়ী করে লাভ নেই ; ছিদ্র আমাদের মধ্যেই নিহিত ছিল। এবং তা একদিনে গড়েনি। আমাদের পূর্বসূরীদের চিন্তাভাবনা এবং সমাজ-বিশ্লেষণের মধ্যে কোথাও ত্রুটি ছিল। আমাদের জাগরণ-আন্দোলনে মুসলিমদের ভূমিকার আশ্চর্য নীরবতার জন্য মুসলিমদের দায়িত্ব নিশ্চয় ছিল। কিন্তু একথাও অস্বীকার করে লাভ নেই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ চিন্তানায়ক এবং আন্দোলনকারিগণ তাঁদেরকে আপন দলে ও আদর্শে একাত্ম করে নিতে পারেন নি। যাঁরা বা তাঁদের দলে ছিলেন, তাঁরা জমিদার গৃহে দরিদ্র নিমন্ত্রিতের মত দায়িত্ব লাভ করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। ইংরাজরা এর সুযোগ গ্রহণ করেছেন মাত্র।

আরও একটি কথা। আমাদের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টায় ভাবাবেগের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। গান্ধীজীর অনশন ব্রতের মধ্যে ব্যক্তিগত সততা ও শুদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তাই দীর্ঘস্থায়ী ফল ফলতে পারেনি। মানুষের অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে যে-যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ রেজাউল করীম পেনের "রাইট্‌স্‌ অফ ম্যান" বা লেকীর "রাইজ অ্যাণ্ড ইনফ্লুয়েন্‌স্‌ অফ র‍্যাশনালিজ্‌ম" গ্রন্থে পেয়েছিলেন, গান্ধীজীর হিমালয়-সদৃশ উচ্চ ব্যক্তিত্বের মধ্যেও তিনি তার সন্ধান নিশ্চয় লাভ করেন নি। অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য অসম শ্রেণী-সংগ্রাম-হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল ; তাছাড়া নিজ নিজ স্বার্থের

ধারণার সাম্প্রদায়িক চরিত্র তাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একত্রিত করতে পারে নি। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই দুর্বলতা আজ নতুন আলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

"ইন্দো-ইরাণীয়ান সাহিত্যে জাতীয় অনুভূতি" আর একটি মূল্যবান রচনা। ভারতে মুসলিম শাসন-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর—রেজাউল করীমের ভাষায় "তারা বিদেশী হয়ে থাকেন নি। এ-দেশের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে গেলেন। "আর তার একটি অপূর্ব ফল হল হিন্দু-মুসলিম চিন্তামিনিময়জাত একটি সাধারণ সাহিত্য থাকে রেজাউল করীম বলতে চেয়েছেন জাতীয় সাহিত্য। আমীর খুসরু তো এ-বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে তাঁর ভারত-প্রীতির জন্য তাঁকে হিন্দু-আখ্যাও লাভ করতে হয়েছিল। আমাদের বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ জাতীয় অনুভূতি প্রথম বা মধ্যযুগের ধর্মশাসিত পরিমণ্ডলের মধ্যে ছিল না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে (যেমন, গোপাল হালদার—"বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা—১ম খণ্ড) সৈয়দ আলাওলের কাব্যেই প্রথম বৃহৎ জাতীয় অনুভূতির আস্বাদ লাভ করা যায়। আজ হতে প্রায় সাত আট শত বৎসর পূর্বে আনীর খুসরুর সাহিত্যে ও ভাবনায় এই জাতীয় অনুভূতির সন্ধান লাভ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাছাছাড়াও, মির্জা জামজানান মাজহার, আব্দুর রহীম খান খানান, আবুল ফজল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের রচনার মধ্যেও এই জাতীয় অনুভূতি লাভ করা গেছিল।

গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ "বংকিমচন্দ্রের নিকট মুসলমানের ঋণ" ১৯৩৮ সালে বংকিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত। আমাদের দেশের ইতিহাসের বহু বিচিত্র বিতর্কের মধ্যে একটি হল বংকিমচন্দ্র ও মুসলমানকে কেন্দ্র করে ঘণীভূত একটি বিতর্ক। বিশ শতকের প্রথমার্ধের বিভিন্ন রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের উত্তর সন্ধানের একটি পদক্ষেপ ছিল বংকিমচন্দ্র মুসলমানদের ও ইসলামের উপর বিরূপ ছিলেন না, এটা প্রমাণ করা। রেজাউল করীম তাঁর সহজাত উদারতার জন্য এই প্রমাণ আবিষ্কারকে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এসম্পর্কেই তাঁর গ্রন্থ "বংকিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ"। সম্প্রতি "আনন্দমঠের" শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবাংলা জুড়ে বংকিমচন্দ্র ও মুসলমানকে নিয়ে

যে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে, সেকালে বংকিমচন্দ্র সম্পর্কে রেজাউল করীম কী অভিমত পোষণ করতেন সেইটি বর্ত্তমান কালের পাঠক সাধারণের নিকট সন্নিবেশিত করলাম। বলা বহুল্য রচনার তাৎক্ষণিকতা হতে জাত ছোটখাট কিছু অসংগতি লেখকের অনুমতি সাপেক্ষে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করা হল।

আমি ইতিপূর্বে একবার বলতে চেয়েছি, বংকিমচন্দ্রের প্রতি রেজাউল করীমের বিশুদ্ধ সাহিত্য প্রীতি-জাত একপ্রকার অতিরঞ্জিত শ্রদ্ধার ভাব ছিল বলেই বংকিমচন্দ্রের (ঊনবিংশ শতকের আরও অনেক চিন্তাবিদের মত) অতীতচারিতার মধ্যে যে হিন্দু উজ্জীবনের সূত্র সন্ধান ছিল তাকে তিনি প্রায় উপেক্ষা করেছেন বলা যায়। তাঁর মূল কথা হল, (বর্ত্তমান প্রবন্ধেও) বংকিমচন্দ্রের নিকট বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুর মতই ঋণী এবং বংকিমচন্দ্রকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে হবে। এর দ্বারা তিনি সেকালে (বর্ত্তমান শতকের তিরিশের দশকে) বংকিম বিরোধী ভাবনার মূলোচ্ছেদ করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঘিরে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, তাকেই দূর করতে চেয়েছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধেরও মূল উদ্দেশ্য ছিল তাই। সেজন্যই এখানে সত্যি সমালোচকের যুক্তি অপেক্ষা আবেগের প্রাবল্য প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য বর্ত্তমানকালের তীক্ষ্ন সমাজ বিশ্লেষণের ফলে সেকালের কিছু ভাবনা-চিন্তার পুনর্মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। বংকিমচন্দ্র শৈল্পিক বিশালতাকে স্বীকার করেও তাঁর সম্পর্কে নতুন চিন্তার সূত্রপাত হলে সেটা আমাদেরই চিন্তাপ্রবাহের গতি ও প্রাণশক্তিরই পরিচয় বলে প্রমাণিত হবে।

শিল্প-হিসাবে প্রবন্ধগুলির সার্থকতা শিল্প-সমালোচকরা বলতে পারবেন। আমি শুধু দু একটি কথা বলি। রচনাগুলি সহজ, সরল ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিত হয়েছে। পাঠকের মর্মমূলে প্রবেশ করে এক ধরণের আনন্দ সৃষ্টি করা শিল্পের কাজ। সেদিক দিয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলির সার্থকতা। কথায় বলে "Style is the man"। রেজাউল করীমের সন্তসুলভ সরলতা তাঁর রচনার অন্যতম প্রসাদগুণ। বার বার

রচনার মাঝে তাদের স্রষ্টার কথা আমাদের মনে পড়ে। ভাষা সম্পর্কে দু একটি কথা। কোন কোন প্রবন্ধ সাধু ভাষায় লিখিত; কোনঁ কোনটি চলিত ভাষায়। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে লিখিত বলে সেই সময়ে লেখকের রচনারীতির দ্বারা ভাবিত। সম্পাদনার সময় প্রবন্ধগুলির রচনারীতির (সাধু-চলিত) অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রেখে দিলাম এই জন্য যে, বিশেষ বিশেষ রূপ (সাধু-চলিত) বিশেষ বিশেষ ভাবের বাহন।

গ্রন্থের শেষে পাঠক সাধারণের কৌতুহল চরিতার্থ করার জন্য রেজাউল করীমের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা দিয়েছি। বাংলা-ইংরাজী সহ দু একটি গ্রন্থের প্রকাশ-কাল পাওয়া যায় নি। কোন কোন গ্রন্থের ১ম সংস্করণের প্রকাশ-কাল না পাওয়ায় ২য় সংস্করণের প্রকাশ-কাল দিয়েছি। এই তালিকার অধিকাংশ পুস্তকই তাঁর নিকট নেই। তিনি এ বিষয়ে বাস্তব বুদ্ধিজাত সংরক্ষণে সম্ভবতঃ অমনোযোগী ছিলেন। কিছু বই ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আছে। অধিকাংশের নাম, প্রকাশকের নাম এবং প্রকাশ-কাল অনেক কষ্টে সংগ্রহ করতে হয়েছে। এর বাইরেও তাঁর রচিত কোন পুস্তক যদি থাকে, তা বাদ গেলে, তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি স্বীকার করি সে আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। কোন সহৃদয় ব্যক্তি এ বিষয়ে আমাকে জানালে বাধিত হব। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলির সম্পাদনা কার্যে দায়িত্ব-গ্রহণের পূর্ণ তথ্য আপাততঃ না থাকায় তার যথার্থ কাল নিরূপণ করা সম্ভব হল না। সেইজন্য দু একটির ক্ষেত্রে আনুমানিক সাল দেবার চেষ্টা করেছি।

এইবার শেষ কথা। এইসব সমন্বয় বাদী প্রবন্ধের সংকলনের মধ্য দিয়ে আমরা রেজাউল করীমের উদার চিন্তাধারার পরিচয় দান করবার ব্যবস্থা করেছি। এই আয়োজনের মূল পরিকল্পনা এবং সে-বিষয়ে আর্থিক সহযোগিতা দান করে বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ) অভিজাত খাদি প্রতিষ্ঠান চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশমখাদি সমিতির শ্রী নন্দ চৌধুরী এবং শ্রী শশাংক চৌধুরী মহাশয় আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থের প্রকাশক বুক ট্রাস্টের শ্রী বরুণ গাঙ্গুলী মহাশয় এই ধরণের প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশের ঝুঁকি গ্রহণ করে নিজের অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যেও যে এই গুরু-

ভার বহন করেছেন, তার জন্য তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ। প্রখ্যাত চিন্তাশীল লেখক শ্রী অন্নদাশংকর রায় মহাশয় এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, বলে তাঁর নিকট আমরা সামগ্রিকভাবে কৃতজ্ঞ।

পাঠক সাধারণের নিকট আমার বিনীত আবেদন; লেখকের সঙ্গে নৈকট্যের অবসরে যদি এই গ্রন্থের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন কালে তাঁর সম্পর্কে কোথাও কোন অতিরঞ্জন প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাঁরা যেন নিজগুণে তা ক্ষমা করেন।

পরিশেষে এই আশা প্রকাশ করি—রেজাউল করীমের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের স্বপ্ন ও সাধনা সফল হোক, দেশের সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা দূর হোক, এবং স্বাধীন চিন্তাধারা সংস্কৃতি সমন্বয়ের ইতিহাস-আলোচনাকে পবিত্র, সৎ ও বলিষ্ঠ করুক।

ভারতে ধর্মসমন্বয় ও রামকৃষ্ণ পরমহংস

"ইমিটেশন অব্ ক্রাইস্ট" গ্রন্থের লেখক টমাস এ কেম্পে একস্থানে বলেছেন, পৃথিবীতে সকলেই শান্তি চায়। কিন্তু যে সব কাজ করলে শান্তি স্থাপিত হতে পারে, তা খুব কম লোকই চায়। ঠিক তেমনি বলব, নানা লোকের মুখে শুনতে পাই "ধর্ম সমন্বয়ের" কথা। কিন্তু যে কাজ করলে ধর্মসমন্বয় সম্ভব হবে, তা খুব কম লোকই করে। এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা মনে করে, প্রত্যেকটি ধর্ম পরস্পরবিরোধী। তাদের দৃষ্টিতে এক সম্প্রদায়ের যা ধর্ম, অপর সম্প্রদায়ের তা অধর্ম। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম সম্বধে সঠিক ধারণা থাকলে কখনোই এরূপ মনে হবে না। বরং এই মনে হবে যে, সমস্ত ধর্মই মূলতঃ একই উৎস থেকে আগত, একই উদ্দেশ্য সাধন করেও একই লক্ষ্যে মানুষকে নিয়ে যায়। সুদূর অতীত কালে অনেক মহাপুরুষ ধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ উদার মত্ পোষণ করতেন। বর্তমান যুগে মাত্র এক শত বৎসর পূর্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নিজের জীবনের দ্বারা যে-উদার আদর্শ স্থাপন করেছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। অপর সাধকগণও ধর্ম সম্বন্ধে উদার উক্তি করেছেন। কিন্তু নিজের জীবনের বিভিন্ন সময়ে সকল ধর্মমত পালন করে সকল ধর্মের মূল কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে ধর্মসমন্বয়ের যে আদর্শ রামকৃষ্ণ স্থাপন করেছেন তা অভিনব ও বৈপ্লবিক। "আপনি আচরি' ধর্ম অপরে শিখাও"—এই নীতির তিনি জীবন্ত প্রতীক। সেই জন্য বলতে পারি, তিনি এ-যুগের ধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শের মূল প্রতিষ্ঠাতা।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, ধর্মসমন্বয় বলতে কী বোঝায়? বিভিন্ন ধর্মের সার সত্য ও মূল নীতিগুলি গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে একটা সংযোগ ও সমন্বয় সাধন—এর নাম ধর্মসমন্বয় নহে। এরূপ উদ্যম যে হয়নি, তাহা

নহে। কিন্তু যারা এরূপ উদ্যম করেছেন, তারা ব্যর্থ হয়েছেন। উদাহরণ, আকবরের দীন-ই-ইলাহী। ধর্মসমন্বয় বলতে আমরা অন্য জিনিস বলি। সব ধর্মই সত্য—সব ধর্মেই মুক্তি আছে। ধর্মমতে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক উদারতার সহিত সকল ধর্মকে দেখবে, কাহারও নিন্দা করবে না। এক উদার মনোভাবের দ্বারা এমন একটা সুস্থ পরিবেশ রচনা করবে যেন সকল ধর্ম স্বাধীনভাবে প্রতিপালিত হবে। এক ধর্মাবলম্বী লোক অন্যের সহিত প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সহিত মিলিত হবে, বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে, ভালবাসবে। এইভাবে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হবে, যার ফলে প্রত্যেকে উপলব্ধি করবে, মানুষ বিভিন্ন পথে একই মহান বিধাতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এক ধর্ম যদি মনে করে, অন্য সব ধর্ম মিথ্যা, কেবল আমার ধর্মই সত্য, ও মুক্তি-নির্বাণ মোক্ষ কেবল আমার ধর্মেই আছে, তবে সে কখনও উদার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি প্রত্যেক ধর্ম অপর ধর্ম সম্বন্ধে এই প্রকার অনুদার ধারণা পোষণ করে, তবে ধর্মের নামে শান্তি আসবে না, আসবে অশান্তি। পৃথিবীতে খুব কম লোকই ধর্ম সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করেন। তাই যুগে যুগে পৃথিবীতে ধর্মের নামে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ হয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক নীতির মধ্যে এমন কোন পার্থক্য নাই যার জন্য তারা একত্র মিলিত হতে পারবে না, পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না। এমন এক অবস্থার কথা কল্পনা করতে হবে যখন বিভিন্ন ধর্ম একই ক্ষেত্রে মিলিত হবে—তারা নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। এবং সেই সম্মিলিত ধ্বনি ঈশ্বরের নিকট পৌঁছুবে। ধর্মকে এইভাবে যাঁরা দেখেন তাঁরাই সত্যকার মহাপুরুষ। তাঁরা নিজের জীবনে সকল ধর্মের আদর্শ অনুসারে চলতে পারেন। তাঁরাই পরমহংস।

অতীতকালে ভারতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এই প্রকার মিলন, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। যদি এই চেষ্টা অক্ষুণ্ণ থাকত, তবে সেটা ভারতের পক্ষে কত শুভকর হ'ত। দেখা গেছে, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দীর্ঘ সময় একই সঙ্গে বসবাসের ফলে দৈনন্দিন জীবনে একই স্বার্থের জন্য, রাজনীতিতে একই সমস্যার জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হয়েছে।

আমরা প্রথমেই নাম করব মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের। ধর্ম ব্যাপারে তাঁর মত উদার লোক সে-যুগে ছিল না। তিনি হিন্দুদের মত বহু মুসলমানকে তাঁর শিষ্য করেছিলেন। ইহারা চৈতন্যদেবের প্রেমের ধর্ম গ্রহণ করেছিল। যবন হরিদাস তাঁর একজন বিশ্বস্ত শিষ্য ছিলেন। রামানন্দ আর একজন সাধু ছিলেন, যাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন কবীর। রামানন্দ জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। ক্রিয়াকাণ্ডের উপরে ঈশ্বর প্রেমকে পূর্ণ মর্যাদা তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—He who devotes himself to God is God.—যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করে, সে নিজেই ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলিম fusion-এর মূর্ত প্রতীক ছিলেন তাঁরির শিষ্য কবীর। তিনি তাঁর পথে হিন্দু-মুসলমানকে একত্র করেন এবং তাঁদেরকে প্রেম ধর্মে দীক্ষিত করেন। কবীর-পন্থীরা তাদের নিঃশ্বাসের সংগে ঈশ্বরকে স্মরণ করত। হিন্দু যোগীদের পদ্ধতিতে সাধক রবি দাস ও নামদেব ছিলেন কবীরের সমসাময়িক ব্যক্তি। এঁরা তাঁর দ্বারা বহুভাবে প্রভাবিত। রবিদাস ছিলেন চামার।

কবীরের পর এলেন নানক। নানকও একদিক দিয়ে সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেন। তিনি জাতিভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ছিলেন। নানকেরও মুসলমান শিষ্য ছিল। এই মুসলমান শিষ্যগণ বলেন যে, তিনি একজন সুফীর দ্বারা মিস্টিসিজম শিক্ষা করেন। বাগদাদে তাঁর শিক্ষা আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সেই ইসলামিক দেশে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নানকের প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

কবীর ও নানকের পর উল্লেখযোগ্য সেন্ট দাদু। তিনি হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ের জন্য চেষ্টা করেন। কবীরের মত তিনিও আচার-অনুষ্ঠানকে পছন্দ করতেন না। তাঁর প্রধান শিষ্যের মধ্যে ছিলেন শেখ বাহারজী, বাকারজি এবং রজবজি। সুদূর আসামে এমনি একজন সন্তের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর নাম শঙ্করদেব। বৈষ্ণব মতবাদ অপেক্ষাও তাঁর মত অধিকতর উদার ছিল।

গৌড়ের সনাতন গোস্বামী একজন হিন্দু সাধু। তিনি একটা নূতন দল গঠন করেন; নাম, দরবেশিয়া। ইহা বৈষ্ণব ও বাউল মতবাদের মত। এদের মতের সহিত এই মতের নৈকট্য আছে। তাঁরা তসবিহ ও মালা ব্যবহার করত। মুসলিম ফকীরদের মত আলখাল্লা পরতেন। তাঁদের সঙ্গীতে

আল্লা-ঈশ্বরের নাম থাকত। এইসব হিন্দু-সাধুদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ধর্ম-জিজ্ঞাসায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী রেখেছিলেন। তাঁরা ধর্মের বহিরঙ্গকে বাদ দিয়েছেন। হিন্দুদের metaphysical দিকের সহিত সেমেটিকদের নৈতিক দিকের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। এইসব শিক্ষকদের প্রভাবে ধর্মের গোঁড়ামী হ্রাস পেয়েছিল। এই যুগের সাহিত্য হিন্দু চিন্তা-ভাবনায় পূর্ণ। মুসলমানগণ নিজেদেরকে সম্বোধন করত ভারতীয় ভাষায়। এই যুগে যেসব হিন্দু কবির আবির্ভাব হয়েছিল তাঁরা মুসলিম স্টাইল এবং মুসলিম কবিগণ হিন্দু স্টাইল গ্রহণ করতেন।

এই প্রসঙ্গে কবি আমীর খোসরুর নাম করব। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তিনি এত উদার ছিলেন যে গোঁড়া মুসলিমগণ তাঁকে পুতুল পূজক বলত। তার উত্তরে তিনি বলতেন—

"প্রেম থেকে আমার জন্ম। আমার জন্য ইসলামের দরকার নাই। আমার সমস্ত শিরায় আছে পবিত্র উপবিত। অন্য কোন সূতার দরকার নাই। লোকে বলে খোসরু প্রতিমা-পূজা করে। অবশ্যই আমি ইহা করি। জগতের লোকের আমার কোন দরকার নাই।"

১৫৬৫ সালে কামালের আবির্ভাব। তাঁর কবিতায় দেখি, হিন্দু মহাপুরুষ ও দেবদেবী একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে :—"রামের নামে আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়েছে। লক্ষ্মণের নাম আমাকে আমার গন্তব্যস্থল দেখিয়েছে; কৃষ্ণের নামে আমি সমুদ্র পার হই; আর বিষ্ণুর নামে আমি হৃদয়ে শান্তি পাই।"

মালিক মুহম্মদ জায়সীর আবির্ভাবের সময় (১৫২৮ খৃঃ) মুসলিম লেখকের মধ্যে হিন্দু Allegory প্রবেশ করে। হিন্দুদের transmigration of soul—আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে eternal synthesis তাঁর "পদ্মাবৎ" কাব্যে অভিব্যক্তি লাভ করে। এই গ্রন্থে আলাউদ্দীন ও চিতোরের রানার সংগ্রামের মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন, আত্মার মধ্যে forces of good and evil এর একটা সংগ্রাম চলছে।

রজ্জব (১৫১৮—৯৮) সেন্ট দাদুর প্রধান শিষ্য। তিনি Ram cult-এর অনুবর্তী ছিলেন।

এইসব মহাপুরুষদের জীবনী থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন ধর্মকে এক ধর্মে রূপান্তরিত না করেও এবং নিজ নিজ ধর্মের স্বাতন্ত্র্য ও

অস্তিত্ব বজায় রেখেও উদারতার সহিত ধর্মকে দেখার ফলে ধীরে ধীরে ধর্ম-সমন্বয় হয়ে আসছিল। এই ধারা বরাবর অক্ষুন্ন থাকত। কিন্তু ভারতের উপর রাজনৈতিক বিপ্লব প্রবলভাবে আঘাত করল। সাম্রাজ্যিক স্বার্থে দুই সম্প্রদায়কে পৃথক করার প্রয়োজন হ'ল। তাই এই সমন্বয়ের ধারা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হলেন ; তিনি অদ্ভুতভাবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করলেন। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তিনি সমন্বয়ের অগ্রদূত। তাঁর জীবনে যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও সত্যানুসন্ধান বিকশিত হয়েছিল তা বিস্ময়কর! কেমন করে একজন অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি সাধনার বলে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে উঠলেন তার ইতিহাস বিস্ময়কর। তিনি প্রথমে হিন্দু ধারায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাধনা করলেন। দেখলেন, অন্তর বিশুদ্ধ হলে, সাধনা নিখুঁত হলে ধর্মেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। তিনি এইখানে ক্ষান্ত থাকলেন না। তিনি দেখতে চাইলেন ঠিকভাবে পালন করলে অন্য ধর্মেও ঈশ্বর দর্শন পাওয়া যায় কিনা। তাই তিনি কিছুদিন খৃষ্টানের মত উপাসনা করলেন। ইসলামের আদর্শ অনুসারে চললেন। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন যে, সেই সব পন্থাতেও ঈশ্বরকে দেখা যায়। তখন তিনি ঘোষণা করলেন, "যত মত তত পথ" ; সকল পথেরই লক্ষ্য এক।

বর্তমান যুগে তিনি তাঁর আদর্শ স্থাপন করে দেখালেন যে একজন সত্যসন্ধ মানুষ একই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান হতে পারে। চাই বিশ্বাস, নিষ্ঠা, সাধনা। এর অভাবে কিছুই হবে না। এইসব গুণ না থাকলে যে-ধর্ম পালন কর না কেন, তাতে সত্যোপলব্ধি হবে না। প্রত্যেক ধর্ম সত্য, এই যে মতবাদ তিনি প্রচার করলেন তা এ-যুগে ধর্মচিন্তায় একটি বৈপ্লবিক দিক। সকল ধর্মের মধ্যে তিনি সমন্বয় চেয়েছেন।

ভারত-আরব সম্পর্কের গোড়ার কথা

ভারতবর্ষের সঙ্গে আরব জগতের সম্পর্ক অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। মুসলিমরা যে সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে ভারতে এসেছিল, সেটার পিছনে ছিল রাজনৈতিক অভিসন্ধি—পরদেশে রাজ্য বিস্তারের লালসা। কিন্তু তারও বহু পূর্বে ভারতের সঙ্গে আরব জগতের একটা সাংস্কৃতিক যোগ ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্বে ভারতবর্ষ ও আরবের মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল, বাণিজ্যই ছিল তার প্রধান বাহন। এই বাণিজ্যের মাধ্যমে দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়েছিল। ভারতবর্ষে যে একটি উচ্চাঙ্গের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল, সে খবর আরবরা জানতেন। বৌদ্ধ যুগে প্যালেস্টাইনে ও সিরিয়াতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের যুগে প্রাথমিক মুসলমানরা যে ভারতের কথা, ভারতের সভ্যতার কথা জানতেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রথম যুগের মুসলমানরা ভারতের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখতেন। কথিত আছে যে, হজরত মহম্মদ একবার তাঁর শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন, "আমি হিন্দু দেশ থেকে শীতল বাতাস অনুভব করছি।" এর দ্বারা তিনি এই বলতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে ভারত সভ্য দেশ, আর ভারতবাসী আল্লাহের প্রতি বিশ্বাসী। আরও কথিত আছে যে, হজরতের সময় দুজন ভারতবাসী পণ্ডিত আরবে এসেছিলেন। তাদের একজনের নাম 'রতন'। পণ্ডিত রতন হজরতের বহু মূল্যবান বাণী সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সেই সংগৃহীত বাণী এখনও বিদ্যমান আছে। তাঁর সংগৃহীত বাণী পুস্তকের নাম "রাতানিয়াৎ"।

ইব্‌নে আলি হাতেম হজরত আলির নিকট আর একটা কথা জেনেছিলেন যে, ভারতের উপত্যকা এমন এক সুন্দর জায়গায় অবস্থিত, যেখানে হজরত আদম স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসবার কালে প্রথম পদার্পণ করেন। আর মক্কার উপত্যকা সেই দেশ যেখানে হজরত ইব্রাহিমের স্মৃতি বিজড়িত আছে। এই দুইটি দেশই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ। মৌলনা গোলাম আলি আজাদ অপর একটি হাদিসের উল্লেখ করেছেন। সে হাদিসটি ইব্‌নে আব্বাসের দ্বারা কথিত: পয়গম্বর হজরত আদম স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণকালে একটা স্বর্গের চারাগাছ সঙ্গে এনেছিলেন। সে চারাগাছ ভারতের মাটিতেই বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়। আর পয়গম্বর হজরত মুসার বিখ্যাত 'আসা' বা যষ্টিদণ্ড এই বৃক্ষের শাখাতেই তৈরি করেন। 'সহি মুসলিম' নামক হাদিসে আর হোরেরার কথিত একটি উক্তি আছে যে, হজরত মহম্মদ কতকগুলি নদীর নাম করেন, যেগুলি স্বর্গে অবস্থিত। এগুলির মধ্যে একটি নদী ভারতের নদী। গোলাম আলি আজাদ আরও বলেন যে, কোরআনের মধ্যে "তুবা, সনদাস, আলবাই" এই শব্দগুলি সংস্কৃত ধাতু থেকে উৎপন্ন। পরবর্তী যুগের কতকগুলি মুসলিম লেখক একটি পৌরাণিক কাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি এই যে, পয়গম্বর হজরত নূহের সময় যখন মহাপ্লাবন হয়, তখন তিনি একটি জাহাজের উপর আশ্রয় নিয়েছিলেন। মহাপ্লাবনের পর সেই জাহাজটি ভারতেও এসেছিল এবং নূহের দু-একটি সন্তান ভারতবর্ষেই বসবাস আরম্ভ করেন। অন্য একটি হাদিসে আছে যে, ভারতবর্ষেও একজন পয়গম্বর (তত্ত্ববাহক) এসেছিলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ। তাঁর নাম কান (Kan), কানেসা, কানধা অথবা কানাহিল (Kaniyhl)। এইসব উক্তি থেকে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আরবের প্রাথমিক মুসলমানদের নিকট ভারত অপরিচিত ছিল না। তাঁরা ভারতবর্ষকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলির একটা উক্তি থেকে জানা যায় যে, যে দেশে সর্বপ্রথম স্বর্গীয় গ্রন্থ রচিত হয়, সে-দেশ ভারতবর্ষ। তিনি আরও বলেন যে, ভারত থেকেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর বলেন, ভারতের নদনদীগুলি মুক্তার মত, তার পাহাড়গুলি পদ্মরাগ মণির মত। আর তার বৃক্ষগুলি সুগন্ধি দ্রব্যের মত। তবুও তিনি ভারত আক্রমণের বিরোধী

কারণ তাঁর মতে ভারতবর্ষ এমন দেশ, যেখানে ধর্ম বিষয়ে উদারতা আছে। ইসলামের অনুবর্তীরা ভারতে স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মচর্চা করতে পারে।

উম্মিয়া বংশের রাজত্বকালেও ভারতের সঙ্গে আরবের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়নি। আব্দুল মালিক বিন্ মারওয়ানের সময় বাসরার অর্থ ও রাজস্ব বিভাগে কয়েকজন ভারতবাসী চাকরি করতেন। এঁরা মুদ্রা তৈরির কাজে সাহায্য করতেন। খলিফা মাবিয়া সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি সিরিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে বিশেষ করে আন্তিওকে কতকগুলি ভারতীয় হিন্দুকে দিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তার কারণ, তাঁর ধারণা ছিল, এই সব হিন্দুদের প্রভাবে দেশের প্রভূত উন্নতি হবে। হাজ্জাজ অত্যাচারী শাসক হলেও ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কাশগড়ে ভারতীয়দের একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। "কালো চোখ ও জলপাই রঙ"-এর হিন্দুরা খলিফাদের সময় প্রত্যেক নগরে আদর আপ্যায়ন পেত। তাদের বিদ্যাবুদ্ধির খাতির ছিল সর্বত্র।

আব্বাসীয় বংশের খলিফা আলমনসুর ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি একটি অনুবাদ বিভাগ খুলেছিলেন। এই বিভাগ থেকে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করা হয়েছিল। খলিফা হারুনর রশীদের সময় এবং তারপর খলিফা মামুনের শাসনকালে সিরিয়া, এশিয়া মাইনর ও লেবাননের খ্রীষ্টান মঠ থেকে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেগুলির অনুবাদের ব্যবস্থা হয়। তুর্কিস্থানের বোখারা থেকে বৌদ্ধগ্রন্থের আরবী অনুবাদ করা হয়েছিল। বৌদ্ধ মঠ থেকে বহু ভারতীয় গ্রন্থ আবিষ্কৃত হলে সেগুলিও আরবীতে অনূদিত হয়েছিল। এই সময় খ্রীষ্টান ও ইহুদী ব্যতীত আরও অনেক দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পণ্ডিতেরা বাগদাদে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা রাজদরবারে সম্মানিত হতেন। তাঁদের সমস্ত ব্যয়ভার রাজ দরবার থেকেই দেওয়া হত। তৎকালীন খলিফারা বহু ভারতীয় পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য ভারতের বহু পণ্ডিতকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ দিয়েছিলেন। খলিফা হারুনর রশীদের সময় বারমাক পরিবারের সম্ভ্রান্ত

মানিক ও আরব চিকিৎসক সালেহ্ সে যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একবার খলিফা হারুনর রশীদ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। তখন মানিক তাঁকে আরোগ্য দান করেন। আর একজন ভারতীয় চিকিৎসকের নাম ধান। বাগদাদের বারমাক হাসপাতালের তিনিই ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। বাগদাদের অন্যান্য হাসপাতালে আরও অনেক ভারতীয় চিকিৎসক নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা সংস্কৃত গ্রন্থের আরবী অনুবাদে সাহায্য করতেন। চিকিৎসক মানিক ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের অনুবাদে সহায়তা করতেন। এই গ্রন্থের আরবী নাম "সিন্ধ ও হিন্দ"। পণ্ডিত কঙ্ক বাগদাদের দরবারে প্রধান জ্যোতিষী ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় নীতি ও উপদেশমূলক বিখ্যাত গ্রন্থ "পঞ্চতন্ত্র" যখন আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হল, তখন তার সমাদর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। পঞ্চতন্ত্রের আরবী নাম "কালিলা ও দামনা"। এই গ্রন্থের আরবী অনুবাদ থেকে ইয়োরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়। এর ফারসী নাম "আনওয়ার সোহেলী"।

সে যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ইসমাইল ভারতবর্ষে এসেছিলেন কেবল জ্যোতিষ শাস্ত্র শিখবার জন্য। ২৮০ হিজরীতে আহমদ কাফি দরলাণী ভারতবর্ষে আসেন জ্যোতিষ ও গণিতবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করবার জন্যে। তিনি কেবল জ্যোতিষ ও গণিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, সেই সঙ্গে আরও অনেক বিষয় শিখে ফেললেন। ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম সুধীদের আগ্রহ কেবল বাগদাদের দরবারেই আবদ্ধ ছিল না। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সে যুগের মুসলমান সমাজের মধ্যে এত আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল যে, পরবর্তী কয়েক শতাব্দী সমগ্র আরব জগতে তাদের আলোচনা হত এবং সেগুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একদল আরব ঐতিহাসিক সুধী, পণ্ডিত, ভৌগোলিক, পরিব্রাজক নানা পথ দিয়ে ভারত পরিভ্রমণ করতে আসেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অনেকে ঐ সম্পর্কে নানা গ্রন্থ লিখেছেন।

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত আলবেরুনীর নাম করা যেতে পারে। তাঁর সময় আরব জগতের সুধীমণ্ডলীর মধ্যে যেমন গ্রীক দর্শন পড়বার আগ্রহ জন্মেছিল, সেইরূপ তাঁরা ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান গ্রন্থগুলিকে আরবীতে ভাষান্তরিত করতে উৎসাহ বোধ করতেন। মনীষী আলবেরুনীর পূর্বেই ভারতীয়

জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁদের কিছু ধারণা ছিল। জ্ঞানের পিপাসা বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁরা আরও তথ্য জানতে চাইলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থাদি তাঁরা পড়লেন। সেগুলির সমালোচনাও করলেন। আবদুল্লাহ্ বিন আহম্মদ সারকাস্তি একটি ছোট পুস্তিকা প্রচার করলেন। তাতে তিনি সংস্কৃত সিদ্ধান্ত-এর সমালোচনা করলেন। কতক স্থানে ব্রহ্মগুপ্তের ভুল দেখিয়ে দিলেন। অমনি আর একজন সমালোচক দেখিয়ে দিলেন যে, ব্রহ্মগুপ্ত ঠিকই লিখেছেন। স্পেনের ইবনে-সঈদ আর একখানা গ্রন্থ রচনা করলেন। তাতে তিনিও দেখিয়ে দিলেন যে, ব্রহ্মগুপ্ত ভুল করেননি ভুল বুঝিয়েছেন আবদুল্লাহ নিজেই। একদল আরব পণ্ডিত ভারত ভ্রমণ করেছিলেন ও নিজচক্ষে ভারতবর্ষকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আবার অন্যদিকে ভারত থেকেও একদল হিন্দু পণ্ডিত বাগদাদ এসেছিলেন। এঁরা উভয়েই আরব ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। উভয় অঞ্চলের জ্ঞান বিজ্ঞানের আদান প্রদানের ফলে আরবের বিজ্ঞান-সাধনা অনেক যে উন্নত ধরনের হয়ে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ভারত ও আরবদের মধ্যে আদান-প্রদানের বিনিময়ে একটা ঐক্যসূত্রও স্থাপিত হয়েছিল। আরব সভ্যতার উপর গ্রীক প্রভাবের মতই ভারতীয় প্রভাব গভীর ছাপ রেখে গেছে। গণিত শাস্ত্রের দশমিক বিধি-আরবগণ যে ভারত থেকেই শিখেছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আরবগণ ভারতবর্ষ থেকে যা কিছু শিখেছিলেন তাকে তাঁরা একেবারে নূতন রূপ দিয়েছিলেন এবং নূতন পোষাকে সজ্জিত করেছিলেন। আর তাই আরবদের মধ্যবর্তিতায় ইউরোপে নীত হয়েছিল।

হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে খলিফা মামুন বাগদাদে একটি ধর্মসভার ব্যবস্থা করেন। কতকটা ভারত-সম্রাট আকবরের মত। তাতে সকল ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আহূত হতেন। তাঁরা স্বাধীনভাবে ধর্ম সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতেন। সেখানে কোনও প্রকার অনুদারতার স্থান ছিল না। পরবর্তী যুগের মুসলিম শাসকগণ যদি এই ব্যবস্থাকে চালু রাখতেন, তা হলে অন্ধ গোঁড়ামি তাঁদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করত না। আর তাহলে অত শীঘ্র তাঁদের পতনও হত না। একটা কথা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আব্বাসীয় খলিফাগণের সময় যেরূপ আগ্রহের সঙ্গে ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা হত অপর দেশের ব্যাপার

নিয়ে সেরূপ আলোচনা হত না। তা যদি হত, তবে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ভারত বহু পূর্বে পৃথিবীর মিলন-কেন্দ্র হয়ে পড়ত। ভারত আক্রমণকারী মুসলিমদের তারা অনায়াসে নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে পারত। যেমনভাবে গ্রীক সভ্যতা গোটা রোমকে গ্রাস করতে পেরেছিল। কিন্তু তা হয়নি এবং তার কুফল ভারতের হিন্দু মুসলমানকে সমভাবেই ভোগ করতে হয়েছে।

পরবর্তী যুগে যখন ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন বহু হিন্দু সুধী মুসলিম সংস্কৃতি ও ধর্ম নিয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা আরম্ভ করলেন। খলিফা হারুনর রশীদের সময় ভারতের একজন রাজা বাগদাদের খলিফার কাছে একটি তত্ত্বজ্ঞানী মুসলিম দার্শনিক প্রার্থনা করে পত্র দেন। এই ভারতীয় রাজা এমন লোক চাইলেন যিনি তাঁকে ইসলাম সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন।

২৮০ হিজরীতে অন্য একটি ভারতীয় রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষায় কোরআনের একটি অনুবাদ করা হল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মসুদী বলেন যে, ক্যামব্রের রাজা ধর্মালোচনা করতে ভালবাসতেন। তিনি মসুদীর সঙ্গে পত্রালাপ ও ভাবের আদান প্রদান করতেন। গুজরাটের হিন্দু রাজারা সর্বপ্রকারে ইসলামকে শ্রদ্ধা করতেন। এবং তিনি স্বীয় রাজ্যের মুসলমানদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতেন। গুজরাটের বল্লভ রাজবংশীয় শাসকগণ আরবদের সংগে সদ্ব্যবহার করতেন। বুজরুগ বিন্ শাহরিয়ার নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে আসেন। তিনি তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে লেখেন, "ভারতের হিন্দু শাসকগণ সর্বত্র মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। সিংহলের বৌদ্ধরাও মুসলমানদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন।" এর বহু পূর্বে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের সময় বৌদ্ধ শাসকরা আরবে দু'জন দূত প্রেরণ করেন। এঁরা ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ স্বদেশে প্রেরণ করেন। এই দু'জন দূতের মধ্যে একজন ফেরার পথে দেহত্যাগ করেন। অপরজন নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বলেন যে, খলিফা সাদাসিদেভাবে জীবন যাপন করেন। পর্যটক বুজরুগ বিন শাহরিয়ার আরও বলেন যে, কাশ্মীরের অন্তর্গত আলোরের রাজা নিজের মাতৃভাষায় সমগ্র কোরআন গ্রন্থখানি অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। শাহরিয়ার অন্যত্র বলেছেন যে, তিনি যখন ইরাকের সাইরফ

বন্দর পরিদর্শন করেন, তখন সেখানে তিনি বহু গুজরাটি ও মুলতানী হিন্দু বণিকের সন্ধান পান। আরবগণ এদের নিমন্ত্রণ করত। তাদের খাদ্যের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হত। এইসব হিন্দু বণিক যেভাবে আরবী কথ্য ভাষায় কথা বলত, তাতে মনে হত না যে, তারা ভিন্ন দেশের লোক। সে সময় হিন্দু-মুসলমানের পোষাকের মধ্যেও বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না।

৭১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু প্রদেশ জয় করেন। বিজয়ের প্রথম মুহূর্তে বহু লুঠতরাজ হয়েছিল। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তিনি সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। তিনি দেশের শাসনভার স্থানীয় লোকের হাতে অনেকটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সিন্ধুর হিন্দুরা নিজেদের ধর্মমতে উপাসনার অধিকার দাবি করল। বিন কাসেম একথা তাঁর উপরিওয়ালা ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজের গোচর করলেন। তার উত্তরে হাজ্জাজ লিখলেন যে, হিন্দুদের তাদের নিজের শাস্ত্রানুসারে তাদের দেব দেবীকে আরাধনা করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া গেল। কারো ধর্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা চলবে না। তারা যেমন ইচ্ছা সেইভাবে নিজেদের জীবন যাপন করবে। ব্রাহ্মণগণ চিরাচরিত প্রথা অনুসারে যে সম্মান ও ভক্তি পেতেন, তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। তারা উৎপন্ন শস্যের যে অংশ পেতেন তাতেও কোন হস্তক্ষেপ করা চলবে না। তাঁদের মন্দির নির্মাণে কোন বাধা দেওয়া চলবে না। মোটের উপর বিন কাসিম উদারভাবে শাসন করতেন।

আল্‌ আসতাখরি দশম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি ভূগোল সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তক লিখেছেন। তাঁর একটি পুস্তকে সিন্ধু দেশের একটি মানচিত্র দেওয়া আছে। তিনি বলেন যে, আচার ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও প্রথার মাধ্যমে তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বেশ একটা সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। অপর একজন ঐতিহাসিক আলজাহিজ লিখেছেন ঃ "সে যুগের হিন্দুরা গণিত, চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অন্য দেশের থেকে অনেক বেশী জ্ঞান রাখত। তারা শিল্পে, ভাস্কর্যে, চিত্রাঙ্কনে, স্থাপত্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। এদের নিকট থেকেই আমরা "কালিলা ও দামনা"র মত অতি মূল্যবান গ্রন্থ পেয়েছি। হিন্দুদের বেশ বিচার বুদ্ধি আছে। এরা সাহসী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভালবাসে। ধ্যান করার রীতির তারাই উদ্ভাবক।"

ইয়াকুবী আর একজন আরব পরিব্রাজক। তিনি বলেন, "হিন্দুগণ বুদ্ধি ও চিন্তায় অপরাপর জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাদের গণনা অন্য দেশের জ্যোতিষী থেকে নির্ভুল। 'সিদ্ধান্ত' একটা প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থই প্রমাণ দেবে যে তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। এই গ্রন্থ দ্বারা গ্রীক ও পারসিকরা বহু উপকৃত হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ।"

আজ উর্দু হিন্দী সমস্যা নিয়ে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সেযুগে সেরূপ কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। দেশপ্রচলিত হিন্দী ভাষাকেই সে যুগের মুসলমানরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বহু মুসলমান শাসক, কবি ও শিল্পী ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক বুঝাপাড়ার জন্যে চেষ্টিত ছিলেন। সে যুগের বহু মুসলমান আরব, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশে ভারতের সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস, ভাবধারা ও চিন্তাধারাকে প্রচার করেছিলেন। সেইদিক দিয়ে আলবেরুনীর সাধনা অনেকটা সার্থক হয়েছিল। সেজন্য তাঁর এদেশের ভাষা শিখবার দরকার হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষা তিনি অনায়াসে শিখে ফেলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে আটজন হিন্দী কবি যশ অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে চারজন হচ্ছেন মুসলিম—মমুদ, কুতুবআলি, আকরম এবং ফয়েজ। তাছাড়া আমির খুসরু, আব্দুর রহিম খানখানান, দাউদ, মালিক মহম্মদ জইসী—এঁরাও হিন্দী-সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তাঁরা সাধক কবীর ও তাঁর পুত্র মুল্লা কামালের নিকট অনেক ভাবে ঋণী। কুতুবান, জানজাহান, ওসমান, শেখনবী- নুরমহম্মদ কাসিম—এঁদের কবিতা ও রচনার দ্বারাও হিন্দী সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। রহিম খাঁর নীতিমূলক কবিতা তুলসীদাসের 'দোহা' অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। হিন্দী সাহিত্যে কাদির, জহীর ও মোবারক উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। হিন্দী কবি বাস খাঁ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। তিনি চমৎকার ভাষায় শ্রীশ্যাম ও গোপিনীদের নামে বহু গান রচনা করেছেন এবং তা নিজেই গাইতেন।

আলবেরুনীর 'ভারত বিবরণ' ভারত ও আরবের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলন ও ঐক্য স্থাপনের পথ অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য আরবের বহু মুসলিম পশ্চিম উপকূলে আসেন। মালাবারে তাঁদের প্রভাব দ্রুত বেড়ে উঠল। এই সম্পর্কে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, নবম শতাব্দীতে মালাবার রাজবংশের শেষ রাজা ইসলাম

ধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি আরবে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই খানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্বে কয়েকজন আরবকে ভারতে প্রেরণ করেন। তাঁরা আরব ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। কালিকটের জামোরিন আরব বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আরব বণিকরা তার বিনিময়ে যুদ্ধের সময় তাঁকে সাহায্য করত। সে সময় হিন্দুরা সাধারণত সমুদ্রযাত্রা করত না। সুতরাং তিনি আরব নাবিকদের সাহায্যে তাঁর নৌবিভাগটি গড়ে তোলেন।

মধ্যযুগে কয়েকজন সাধকের আবির্ভাব হয়। তাঁদের প্রভাবে উদার ধর্মমত দ্রুত প্রসার লাভ করে। রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধবানন্দ, নিম্বার্ক প্রমুখ ধর্মাচার্যগণ উদার ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন। তার ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও মিলন সম্ভব হয়েছিল। তাঁদের চিন্তা ও আদর্শ ইসলামের সাম্যের আদর্শের অনুরূপ। তাঁদের সাধনায় গোঁড়া ধর্মের প্রভাব ক্রমে হ্রাস পেতে লাগল। শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর ধর্মসমন্বয়ের যে ধারা প্রবাহিত করলেন, তা সারা দেশকে প্লাবিত করে দিল। এঁদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকলে এদেশে কোনদিন সাম্প্রদায়িক কোলাহল আত্মপ্রকাশ করত না। কীভাবে ভারতের আদর্শের সঙ্গে আরবের আদর্শের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছিল তার আর একটি প্রমাণ দিব। সুফী সাধকদের আদর্শ হচ্ছে 'ফানাফিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলোপ করা। এই আদর্শটি বৌদ্ধদেবের 'নির্বাণ' আদর্শের অনুরূপ। অজ্ঞাতসারে নির্বাণের আদর্শই সুফীদের মধ্যে প্রবেশ করে, এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। শরীয়ৎ মেনে চলে এমন কোন মুসলমান বলবে না যে, 'আমি খোদা'। অথচ আরবের বিখ্যাত সাধক মহর্ষি মনসুর ভাবের আবেগে হঠাৎ বলে উঠলেন; 'আনলহাক' অর্থাৎ 'আমিই খোদা'। তাঁর সময় বেদান্তের 'সোহহং' আদর্শই সমধিক ভাবে আরবে প্রচারিত হয়েছিল নতুবা কোন মুসলমানই 'আমিই খোদা' একথা বলতে সাহসী হত না। আর ঐ কথা মনসুর বলেছিলেন বলে তাঁকে কাজীর আদেশে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সুফীগণ 'জিকর' করেন তাও ভারতের যোগপ্রথা থেকে গৃহীত। এইভাবে ধীরে ধীরে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে সমন্বয় হয়ে আসছিল। বস্তুত ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে আরবের ক্ষতি তো হয়ই নি বরং বহুবিষয়ে উপকার হয়েছে। ভারতবর্ষ

মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু তারা বিদেশী হয়ে থাকেনি। এদেশের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে গেলেন। যদি ইউরোপীয় শক্তি ভারত প্রবেশের কোন পথ ও সুযোগ না পেত, তা হলে হয়ত শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানগণ একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে নিত। হয়ত, তারা সবাই 'এক দেহে লীন' হয়ে যেত। উপসংহারে এইটুকু বলব যে, আজ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আবার সুযোগ এসেছে যখন সব ভেদাভেদ দূর করে সকলকে মিলন ঐক্য সংহতি ও সমন্বয়ের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে হবে। ভারতবর্ষ বরাবর বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সাধনা করেছে। আজও সেই সাধনা করতে হবে।

ভারতীয় মুসলমানের উপর হিন্দু প্রভাব

ভারত বিভাগের পূর্বে মুসলিম সমাজের একটা বিরাট অংশ এই দাবী করিয়াছিলেন যে তাঁহারা একটা স্বতন্ত্র জাতি; ভারতের হিন্দু ও অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের কোন জাতীয় সম্পর্ক নাই। শত শত বৎসর ধরিয়া একই দেশে পাশাপাশি একই সঙ্গে বাস করা সত্ত্বেও মুসলিম সম্প্রদায় এদেশের মাটির সহিত মিশিতে পারে নাই। তাঁহাদের সংস্কৃতি আচার বিচার, ভাষা, চালচলন, সবই স্বতন্ত্র ও পৃথক। সুতরাং স্বতন্ত্র জাতি হিসাবেই তাঁহারা এদেশে থাকিবেন, আর সেজন্যই একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তাঁহারা চাহিয়া বসিলেন। যাঁহারা এই ধরনের কথা বলিয়াছেন তাঁহারা ইতিহাসকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সত্য বটে, ধর্ম ও আচার বিচার ইত্যাদি ব্যাপারে এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, কালের অমোঘ প্রভাবে ক্রম বিবর্তনের পথে ধীরে ধীরে কখনও জ্ঞাতসারে কখনও অজ্ঞাতসারে ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যে ভারতীয় তথা হিন্দু ভাবধারা প্রবেশ করিয়াছে। এই বিষয়টা লক্ষ্য করা হয় নাই বলিয়াই স্বতন্ত্র জাতিত্বের দাবী উঠিয়াছিল। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতে দুই জাতিত্বের থিওরী অচল। ভারতীয় বহু মুসলমান ভাবিয়া থাকেন যে, তাঁহারা আরব, ইরান, তুরান, মিশরের মুসলমানের সঙ্গে সব বিষয়েই এক, কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা ভুল। এক ত নহেই, বরং বহু বিষয়েই বহু পার্থক্য বিদ্যমান আছে। ধর্মের দিক দিয়া সব মুসলমানই এক। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া বিভিন্ন দেশে বসবাস করার জন্যে আরব, ইরানের মুসলমান এবং এদেশের মুসলমান সমাজের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন

সভ্যতা সংস্কৃতির স্পর্শে থাকার ফলে মুসলমান সমাজ আরবের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বিচ্ছেদ কেবলমাত্র ভৌগোলিক নহে—মনের বিচ্ছেদও হইয়াছে। পৃথিবীর যেখানেই সে গিয়াছে, সেইখানকার জল বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সংস্কৃতিগত সমন্বয়ও হইয়াছে। ভারতেও এই সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। পাঠান আমলে যে সমন্বয় আরম্ভ হইয়াছিল, দাদু, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ সাধকগণ যে সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন মোগল আমলে তাহা আরও পুষ্টিলাভ করে। পাঠান আমলে শাসকদের পক্ষ হইতে সমন্বয়ের জন্য বিশেষ কিছু করা হয় নাই, কিন্তু মোগল আমলে শাসকগণ ভারত-আরব সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের বহু প্রকার চেষ্টার ফলে হিন্দুদের মধ্যে যেমন ইসলামিক প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ অনায়াসে মুসলমান সমাজের মধ্যেও হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে অব্যাহত ভাবে চলিয়াছিল সমন্বয় সাধনের ধারা। আওরঙ্গজেব অত্যধিক ইসলাম প্রীতির জন্য সেই ধারাকে বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বড় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। যখন মুসলমান সমাজের পরতে পরতে ভারতীয় তথা হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব প্রবেশ করিয়া ভারতীয় মুসলমানকে আরবীয় মুসলমান হইতে বহুদিক দিয়া পৃথক করিয়াছে, তখন কোন অনুদার শাসকের প্রতি-ক্রিয়াশীল নীতি বা অনুশাসন সমন্বয়ের গতিরোধ করিতে পারে না। আওরঙ্গজেব তাহা পারেন নাই। বরং ফল হইয়াছে উল্টা। রাজনীতির দিক দিয়া তিনি মোগল গরিমার সমাধি রচনা করিলেন। কিন্তু যে "খাঁটি" ইসলাম রক্ষার জন্য তিনি এতসব অনুদার পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহা একটুও সফলতা লাভ করিল না। আওরঙ্গজেবের পরে তাঁহার ধর্মান্ধতার কীর্তিকলাপ দুঃস্বপ্নের মত অল্পদিনের মধ্যে কোথায় বিলীন হইয়া গেল। আওরঙ্গজেবের পরেই মোগল শক্তির পতন আরম্ভ হইল। এই পতন-যুগে বহু অঞ্চলে বিদ্রোহ বিপ্লব দেখা দিল। আশ্চর্যের কথা এই যে, এইসব বিদ্রোহ বিপ্লব কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হয় নাই। তাই দেখা যায় যে, কোথাও কোথাও হিন্দু রাজা মুসলমানের সহযোগিতা লইয়া মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। আবার অনেক স্থলে মুসলমান শাসক হিন্দুর সাহায্যে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাইয়াছে। ভারতবর্ষ যদি ইউরোপীয় শক্তির দ্বারা অধিকৃত না হইত, তবে দেশের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে

একটা পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হইয়া যাইত। একই দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় বসবাস করিলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ইতিহাসে ইহার বহু প্রমাণ আছে। রোমকগণ যখন খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করিল, তখন কিছুদিন তাহাদের মধ্যে দুইটি আদর্শ সমানভাবে ক্রিয়া করিতে লাগিল। সত্য বটে, পৌত্তলিক রোমকগণ খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবে বাহিরের দিক দিয়া অ-পৌত্তলিক হইয়া গেল; কিন্তু তাহারাও এমনভাবে খৃষ্টানগণকে প্রভাবিত করিল যে, চিন্তায়, ভাবে, আচরণে তাহারা মূলত রোমকই হইয়া রহিল। এমন কি বহু আচার ও অনুষ্ঠান রোমান সভ্যতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে আজিও ইওরোপের বহু ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে রোমান প্রভাব পাওয়া যাইবে। প্রোটেস্টাণ্ট বিপ্লবের সময় পিউরিটান সম্প্রদায় সেই প্রাচীন হিব্রুযুগে প্রত্যাবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সেক্সপীয়ার মিল্টন, শেলী, কীটস্, বাইরন প্রভৃতি কবিদের মধ্যে গ্রীক ও রোমান প্রভাব এত বেশী আছে যে মনে হয় তাঁহারা যেন প্রাচীন কালচারের মধ্যেই পুষ্ট হইয়াছেন। সেইজন্য একজন সমালোচক গর্ব করিয়া বলিয়াছেন, 'উই আর দি চিলড্রেন অব দি গ্রীকস্।' সেইরূপ ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে এত বেশী হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে যে, আমরাও বলিতে পারি, "উই আর দি চিলড্রেন অব দি হিন্দু এরিয়ান্স।" আমরাও আর্য হিন্দুদেরই সন্তান।

আমার কথা শুনিয়া যাঁহারা চমকিয়া উঠিবেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ভারতের মুসলমানের কয়জন আরব, ইরান, তুর্কী, তাতার হইতে আসিয়াছেন? নির্দিষ্ট কতিপয় পরিবার, কিছু সংখ্যক সৈন্য সামন্তদের বংশধর, আর কতক কতক শাসক শ্রেণীর আত্মীয় স্বজনের অধস্তন পুরুষ ব্যতীত ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের অধিকাংশই এদেশের সন্তান। অতীতকালে তাঁহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও হিন্দু ভাবধারা ও হিন্দু সংস্কৃতি একেবারেই বর্জন করিতে পারেন নাই। আজ ভারতীয় মুসলমানদের জীবনযাত্রার মধ্যে হিন্দু প্রভাবের বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে আরব, ইরান প্রভৃতি দেশের প্রভাবের অল্প চিহ্নই অবশিষ্ট আছে। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, মহম্মদ তুঘলক প্রমুখ আদিরের শাসকগণ, যাঁহারা কোন অতীতে মধ্য এশিয়া আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থান হইতে

আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এদেশের কোথাও তাঁহাদের চিহ্নমাত্র নাই। মুসলিম বিজেতাগণ সম্পূর্ণভাবে ভারতের জনগণের সঙ্গে একাঙ্গ হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন। মুসলিম প্রভুত্বের যুগে যেসব জাতি উপজাতি, বংশ প্রভৃতির নাম আমরা শুনিতে পাই, তাহাদের কথা মানুষের মন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। এদেশের বহু লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া মুসলিম সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন এবং এইভাবে মুসলমানগণের আরবী ও ইরাণীয় রূপ ও সংস্কৃতিকেই প্রভাবিত করিয়াছেন। বিদেশের মুসলমানগণ এদেশের ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন, এদেশে বিবাহ করিয়াছেন, এদেশের জনগণের সহিত জীবন সংগ্রাম করিয়াছেন। একই প্রকার জীবিকার পথ গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ভারতের একটা সমজাতীয় ভাব গড়িয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আর তাঁহাদের পুরাতন ভূমিতে ফিরিয়া যান নাই।

ভারতের মুসলমানগণ যে সমাজ ব্যবস্থা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা হইতে বেশী পৃথক নহে। ভারতের বাহিরের মুসলমানের সহিত তুলনা করিলেই এই পার্থক্যটা ধরা পড়িবে। সাম্য ইসলামের একটি প্রধান আদর্শ। এই 'সাম্যবোধ' ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। এখানে রীতিমত উচ্চ বংশ ও নিম্ন বংশের মধ্যে বেশ একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই যে উচ্চবংশ ও নিম্নবংশের পার্থক্য তাহা অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত নহে। বংশ পরম্পরাগতভাবে অভিজাত শ্রেণী মুসলমান সমাজে সৃষ্ট হইয়াছে। মধ্যযুগে ধর্মান্তর আরম্ভ হইয়াছিল প্রবলভাবে। উচ্চবংশ আজ মুসলমান সমাজে একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এইরূপ হইবার প্রধান কারণ মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু প্রভাবের অনুপ্রবেশ। প্রত্যেক সামাজিক ক্রিয়াকান্ড ও প্রথার মধ্যে নারীসমাজ একটা বিশিষ্টস্থান অধিকার করে। আরব ইরানের মুসলিম নারীদের মধ্যে প্রচলিত বহু প্রথা ভারতের মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে পাওয়া যাইবে না। আবার ভারতের মুসলিম নারী সমাজের বহু প্রথা আরব, ইরানে অজ্ঞাত। এখানকার মুসলিম নারী সাধারণত ভারতীয় নারীদের প্রথাই গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ শাড়ি অলঙ্কার, সিন্দুর ব্যবহার, সামাজিক মেলা-মেশার ধরন এইসবই হিন্দুদের অনুরূপ। এখনও বহু অঞ্চলের সধবা নারী কপালে সিন্দুরের ফোটা দেয়। আর বিধবা হইলে সাদা শাড়ী পরিধান করে।

নিকট প্রাচ্যের মুসলিম নারীদের প্রথা এরূপ নহে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যাপারেও ভারতের মুসলিম নারী এদেশের হিন্দুদের মতই চলিয়া থাকে। তবে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যেমন হিন্দুদের মত মুসলিম সধবা নারীরা শাঁখা ব্যবহার করে না। মুসলিম বিধবাগণ হিন্দু বিধবাদের মত খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে না। মুসলিম বিবাহের বহু বহিরানুষ্ঠান হিন্দুদেরই অনুরূপ। গায়ে হলুদ, তেল মাখা, মাথায় তেল দেওয়া, বিবাহ বাসরের নিয়মপদ্ধতি, বরপণ প্রথা, এইসব ব্যাপারে মুসলিম প্রথা হিন্দু প্রথার উপর ভিত্তি করিয়াই যেন রচিত। সামান্য একটু এদিক ওদিক হইতে পারে—কিন্তু মূলত অধিকাংশ প্রথাই এদেশের অনুকরণে গৃহীত হইয়াছে, বিবাহের নীতিগত পার্থক্য অবশ্য অক্ষুণ্ণ আছে। হিন্দু শাস্ত্রঅনুসারে বিবাহ একটা Sacrament বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মুসলিম বিবাহ হইতেছে একটা চুক্তি বিশেষ। কিন্তু ভারতের মুসলিম বিবাহের এই ধারণারও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে। বিবাহটা অনেকটা Sacrament-এর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহে অশ্রদ্ধা, মেয়েদের স্বামীনির্ভরতা এই সব বিষয়ে এদেশের মুসলমানগণ ভারতীয় প্রথাই গ্রহণ করিয়াছে। মোটের উপর হিন্দু মুসলমানের বিবাহ প্রথা অনেকটা একই প্রকার।

আপাত দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্ম ও হিন্দুধর্ম স্বতন্ত্র আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রাক্ ইসলামিক যুগে আরবদের মধ্যে যে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল, ভারতের হিন্দুদের পৌত্তলিকতা সে প্রকার নহে। প্রাচীন বেদ উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র একেশ্বরবাদের আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইসলামের একেশ্বরবাদ হইতে উপনিষদের একেশ্বরবাদ পৃথক নহে। বোধহয় সেইজন্যই মুসলিমগণ হিন্দুধর্মের মূলনীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আর সেইজন্য সমাজের উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে সহজেই হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করিতে দিয়াছিল। কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠান প্রায় একইরূপ। মহরমের সময় এমন কতকগুলি প্রথা ও ক্রিয়াকাণ্ড হইয়া থাকে, যাহা আরবের কোথাও প্রচলিত নাই। এগুলি ভারতবর্ষেই বিকশিত হইয়াছে। শবেবরাতের সহিত শিবরাত্রির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। নবান্ন উৎসব হিন্দু মুসলমান সকলেই পালন করিয়া থাকে। মহরমের মাতমে যেমন বহু হিন্দু যোগদান

করেন; সেইরূপ হোলি উৎসবে মুসলমানকেও রঙ খেলিতে দেখা যায়। মৃত্যুর পরের অনুষ্ঠানে মূল বিষয়ে পার্থক্য আছে। হিন্দুরা শব দাহ করে, আর মুসলমানরা সমাধিস্থ করে। কিন্তু তবুও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে মৃত্যুর পরে যেসব অনুষ্ঠানাদি হয়, তাহা যেন কতকটা একইরূপ। মৃতের আত্মার সদগতির জন্য উভয় সম্প্রদায় প্রায় একইরূপ অনুষ্ঠান পালন করে। মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট দিনে দরিদ্র ভোজন, মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য; বা তাহার আত্মার মুক্তির জন্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় সমাবেশে শাস্ত্রপাঠ এইসব অনুষ্ঠানে বিশেষ পার্থক্য নাই। গৃহে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে অনেক ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায় প্রায় একইরূপ অনুষ্ঠান পালন করে। সন্তানের নামকরণ উৎসব, ক্ষীর খাওয়ান বা অন্নপ্রাশন, সন্তানের মস্তক মুন্ডন এইসবও প্রায় একইরূপ।

পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে, সেখানেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেমন একটা সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। প্রদেশে প্রদেশে পোশাক-পরিচ্ছদের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে স্বতন্ত্র পোশাক খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাংলাদেশের সাধারণ পোশাক হইতেছে ধুতি। আর পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ পোশাক পাজামা। বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান সেই প্রদেশে প্রচলিত পোশাকই ব্যবহার করে। পোশাক দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই কে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত। বাংলার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খায় না বলিয়া সাধারণত বাংলার হিন্দু মুসলমান কেহই টুপি ব্যবহার করে না। আর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে টুপি ব্যবহার করে। ভারতের মুসলমানগণ কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই আরব ও ইরানের পোশাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া এদেশের পোশাকই গ্রহণ করিয়াছে। আরবী পাগড়ি, আমামা, জুব্বা, রিদা আর বড় একটা চলে না। মধ্য এশিয়ার মোঘল পোশাকও অচল হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতেই পোশাকের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ঐতিহাসিক মসুদি বলিয়াছেন ঃ

"The mode of life of both the Hindus and the Moslems was so similar that it was difficult to distinguish one from the other."

ইহার বহুদিন পরে একজন ফরাসী পর্যটক বলেন যে, "দাক্ষিণাত্যে যেসব মুসলমান উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহারা অবিকল হিন্দু প্রথায় পোশাক পরিত।" মুসলিম বাদশাহ ও নওয়াবগণ দেওয়ালী, শিবরাত্রি, হোলি প্রভৃতি উৎসব পালন করিতেন। আর অনেকেই সেই সময় এদেশীয় পোশাক পরিধান করিতে লজ্জিত হইতেন না। আজিও দিল্লীর বহু উচ্চ-বংশের মুসলমান আড়ম্বরের সহিত বসন্ত উৎসব পালন করিয়া থাকেন। সেই সময় তাঁহাদের পরিধানে থাকে বাসন্তী রঙের বস্ত্র। দিল্লীর ফুলের মেলা 'নওরোজ' প্রভৃতি উৎসব ইতিহাস বিখ্যাত। ইহা হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ উৎসবে পরিণত হইয়াছিল। বাহাদুর শাহের সময় পর্যন্ত এই সব উৎসব আড়ম্বরের সহিত প্রতিপালিত হইত।

ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। একই ভাষা যখন সকল সম্প্রদায়ের ভাব প্রকাশের বাহন হয়, তখন আরও নানাপ্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই ভাষাবিভেদের মধ্যেও ঐক্য ও মিত্রতা স্থাপনে সহায়তা করে। ভারতের মুসলমানগণ আরবী ও ফারসী ভাষা এদেশে চালাইতে পারেন নাই। তাঁহারা এদেশের ভাষাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে উর্দু ও হিন্দী ভাষা লইয়া বহু বিতর্ক হইয়াছে, অনেকের বিশ্বাস উর্দু মুসলমানের ভাষা আর হিন্দী হিন্দুদের ভাষা। কিন্তু এ ধারণা ভুল। উর্দু ও হিন্দী উভয় ভাষাই এদেশের মাটিতেই জন্মিয়াছে—এদেশের ভাষা। প্রথম যুগের মুসলিম শাসকগণ তুর্কি ভাষায় কথা বলিতেন আর শাসনকার্য চলিত ফারসী ভাষার সাহায্যে। আজ তুর্কি অথবা ফারসীর কোনটাই সচল নহে। শাসকগণ এদেশের প্রচলিত ভাষার মধ্যে ফারসী ও আরবী শব্দ যোগ করিয়া তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার ফলে ভাষাটা আরও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। উর্দু ভারতের বাহিরে কোথাও চলে না। উর্দুর উৎস হইতেছে সংস্কৃত ও হিন্দী। ইহার বাক্যগঠন ও ব্যাকরণ-প্রণালী হিন্দীরই অনুরূপ। সাধারণত দিল্লী অঞ্চলে উর্দু ভাষা প্রচলিত ছিল। যখন প্রথমযুগে মুসলিমগণ দিল্লীতে বসবাস আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা এই ভাষাকেই গ্রহণ করেন। ইহাই কালক্রমে তাহাদের কথ্যভাষা হইয়া পড়িল। ইহার অনেক পরে কথ্যভাষা লিখিত ভাষাতে পরিণত হইল। বর্তমানে উর্দু ভাষাতে প্রায় পঞ্চান্নহাজার শব্দ আছে। ইহার মধ্যে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার শব্দ হিন্দীভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। বাকী তের হাজার

শব্দের জন্য আরবী ফারসী ও তুর্কীভাষা দাবী করিতে পারে। তাই দেখা যায় যে, বহুযুগ ধরিয়া বহু হিন্দু-মুসলমান স্বচ্ছন্দভাবে উদুভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করিয়া আসিয়াছে।

আবার একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, হিন্দী ভাষাও কেবল হিন্দুর নহে। বহু অঞ্চলের মুসলমান স্বচ্ছন্দে হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছে। শুধু হিন্দী নহে - এদেশের আরও অনেক প্রাদেশিক ভাষা মুসলমানের মাতৃভাষায় পরিণত হইয়াছে। আসামী, ওড়িয়া ভাষা, পাঞ্জাবী ভাষা, গুজরাটী ভাষা, বাংলা ভাষা—তামিল ও তেলেগু ভাষাও সেই সেই অঞ্চলের মুসলমানগণ গ্রহণ করিয়াছে এবং সাধ্যমত সেগুলির পৃষ্ঠপোষকতাও করিয়াছে। মনীষী অলবেরুনী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের সৈয়দ আলী বেলগ্রামী পর্যন্ত এই দীর্ঘযুগে বহু মুসলিম সুধী সংস্কৃত ভাষার প্রতি যথার্থ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। কবি আমির খুসরু, মালিক মহম্মদ জয়সী, খান খানান, কুতুবান, মোল্লা দাউদ, রাইসখান, মহম্মদ ইয়াকুব, ইনশাল্লাহ খান, নাজির আহমদ এইসব কবি ও সাহিত্যিক হিন্দী ভাষার সেবা ও চর্চা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লিখিত কাজের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। আরব ও পারস্যের মুসলিম লেখকগণের লিখিবার বিষয়বস্তু ও ভঙ্গিমার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এ দেশের মুসলিম লেখকগণের লিখিবার বিষয়বস্তু ও ধরন অনেকটা পৃথক। মুসলিম লেখকগণের হিন্দী, গুজরাটী, বাংলা রচনা এ দেশের হিন্দু লেখকগণের অনুরূপ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া আরব পারস্যের কোন লেখক কবিতা লেখেন নাই। অথচ এ দেশের মুসলিম লেখকগণ এ সম্বন্ধে ভুরি ভুরি কবিতা লিখিয়াছেন।

ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা Common Culture সৃষ্টি করিবার প্রয়াস বরাবরই হইয়া আসিয়াছে। প্রথমে ভাষার মাধ্যমে এই চেষ্টা হইয়াছিল। আজ যেমন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন, মধ্যযুগেও সেইরূপ হিন্দু-মুসলমান লেখক ও কবিগণ সর্বত্র সমানভাবে আদৃত ও সম্মানিত হইতেন। এই সাধারণ সংস্কৃতি সৃষ্টি করিবার প্রয়াস কেবল ভাষার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প স্থাপত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল। গণিত, জ্যোতিষ, ভুগোল, চিকিৎসা, দর্শন, নীতিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একটা Common Culture

গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্যযুগের স্থাপত্যের যেসব নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা সমন্বয়ের কথাই প্রমাণ করে। ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্বে মুসলিম শিল্পীগণ একটা বিশেষ ধরনের আর্ট আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের সেই আর্টের ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। এ দেশের আর্টকে বিসর্জন দিতে পারেন নাই, অথবা অপরিবর্তিত অবস্থায় আরব ইরানের আর্টকেও চালাইয়া দিতে পারেন নাই। দুই দেশীয় আর্টের মধ্যে একটা সুন্দর সমন্বয় হইয়াছিল। দামেস্ক, জেরুজালেম, কার্ডোভা (স্পেন) প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম স্থাপত্যের যে সব নিদর্শন আছে ভারতের মুসলিম স্থাপত্য তাহা হইতে পৃথক। ভারতের মুসলিম স্থাপত্যের মধ্যে আছে হিন্দু ও মুসলিম আদর্শের মধ্যে একটা সমন্বয়ের নিদর্শন।

চিত্রাঙ্কন ও সংগীতচর্চার মধ্যেও সমন্বয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন চিত্রকেই মোগল শিল্পীগণ আদর্শরূপে গ্রহণ করেন এবং তাহার উন্নতিসাধন করেন। মধ্য এশিয়া ও পারস্য হইতে বহু শিল্পী ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এদেশের উন্নত ধরনের শিল্পকার্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সুতরাং অনায়াসে এ দেশের শিল্পের মডেল গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এবং হিন্দু শিল্পীদের সহযোগিতায় নূতন পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করিলেন। হিন্দু শিল্পীগণও নবাগত শিল্পকে অগ্রাহ্য করিলেন না। একটা বিশেষ চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার শিল্পী হিন্দু না মুসলমান তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। সংগীত চর্চার মধ্যেও সহজে সমন্বয় হইয়াছে। মুসলিম সঙ্গীতজ্ঞগণ এদেশের নিকট নূতন জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। আবার তাঁহারাও নূতন নূতন সঙ্গীতযন্ত্র ও নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া এ দেশের সঙ্গীতের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ হিন্দুসঙ্গীত ও মুসলিম সংগীত বলিয়া সংগীত-ক্ষেত্রে কোনও রূপ সাম্প্রদায়িকতা নাই। সংগীতে পূর্ণ সমন্বয় হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কাব্য সাহিত্য শিল্পস্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে সমন্বয় হইতে পারে, কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে কি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন সমন্বয় হইয়াছিল? ভারতের সাত শত বৎসরের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এরূপ সমন্বয়ও কিছু কিছু হইয়াছিল। একথা সত্য যে একদল উলেমা বরাবরই প্রচার করিয়া

আসিতেছিলেন যে, ইসলাম ও হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলাম একেবারে পূর্ণধর্ম—অপর ধর্মের নিকট মুসলমানের শিখিবার কিছুই নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অলবেরুণীর আদর্শ অনুসারে বহু মুসলমান পণ্ডিত হিন্দু ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, এই প্রাচীন ধর্মের মধ্যে সারবস্তু আছে, তখন তাঁহারা হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মনীষী অলবেরুণীর কথা অনেকেই জানেন। তাঁহার পরেও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। মধ্যযুগে মুসলিম সুধীগণ হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় বহু মূল্যবান পুস্তক ফারসী ও আরবীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের অনুবাদ হইতে বাগদাদের পণ্ডিতগণ নানাভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন। দর্শনের দিক দিয়া আরবগণের প্রধান 'অথরিটি' ছিল গ্রীকদর্শন। কিন্তু চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের প্রধান অথরিটি ছিল ভারতবর্ষ।

ইসলামে প্রতিমা পূজা নাই। আর হিন্দু সমাজে প্রতিমা পূজা প্রচলিত। প্রথম প্রথম মুসলিম সুধীগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই। কিন্তু পরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, হিন্দুদের প্রতিমা পূজা প্রাক ইসলামিক যুগের আরবদের প্রতিমা পূজা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, তখন তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কয়েকজন মুসলিম পণ্ডিত হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রতিমা ব্যবহারের যে মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। মির্জা মাজহার জান জানান বলেন যে, "প্রতিমা পূজা সুফীদের জিকির পদ্ধতির অনুরূপ। আরবের পৌত্তলিকগণ যে প্রতিমা পূজা করিত, ইহা তাহা নহে। আরবগণ বিশ্বাস করিত যে, প্রতিমা নিজেই ঈশ্বর এবং তাহার অনন্ত শক্তি আছে। সুতরাং প্রতিমাই তাহাদের প্রভু। কিন্তু হিন্দুদের প্রতিমা তাহা নহে। তাহারা প্রতিমাকে ঐশ্বরিক শক্তির যন্ত্র বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রতিমাকেই ঈশ্বর বলে না। মির্জা মাজহার এ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করেন এবং এই কথাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, হিন্দু-দের পন্থায় আছে ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়। তাঁহার মতে সুফী মতবাদেও এই তিনের সমন্বয় সাধিত হয়।

ভারতবর্ষে বহুদিন বাস করার ফলে হিন্দুদের পূজা পদ্ধতির বহু অনুষ্ঠান বেমালুম সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। জপমালা (তসবী), বিশেষ ধরনের সাধনার জন্য নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, নানাপ্রকার যৌগিক ক্রিয়া, যোগীর মত ধ্যানাসন, মাছ মাংসে অশ্রদ্ধা এইসব আচার ও প্রক্রিয়া বহু মুসলিম পীর মুর্শেদ ও সাধক অনুমোদন করিয়াছেন। ইঁহাদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, বেদান্তের বহু বিশ্বাস ও আচার পদ্ধতিকে তাঁহারা ইসলাম জ্ঞানেই অবলম্বন করিয়াছেন। মূল ইসলামের মধ্যে এইসব বস্তুর কোন প্রমাণ নাই। বস্তুত ভারতের সমস্ত সুফী মতবাদটাই বেদান্ত দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। এই ধরনের সমন্বয় অজ্ঞাতসারে হয় নাই। দেশ ও কালের অনুরূপ করিবার জন্য জ্ঞাতসারেই বেদান্ত দর্শনের বহু আদর্শ মুসলিম সমাজের মধ্যে সুফীগণ প্রবর্তন করিয়াছেন। সম্রাট আকবরের "দীনে এলাহি" এইরূপ একটা সজ্ঞান প্রচেষ্টা। রাজকুমার দারা শিকোহ হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সর্বসাধারণ লোকের সহজ পন্থায় ধর্মকে ঐক্য ও প্রেমের ভিত্তিতে গড়িবার চেষ্টা নানা সাধকের দ্বারা হইয়াছিল। তাঁহারা আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কবীর, নানক, দাদু, শ্রীচৈতন্য ও তুকারাম প্রভৃতি সাধকগণ যে নূতন ধর্মবোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আচার অনুষ্ঠানের গন্ডী ভেদ করিয়া সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। মহাত্মা দাদু সার্বজনীন ধর্মের বাণীই প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি উক্তি হইতে বুঝা যাইবে, তিনি ধর্ম বিষয়ে কিরূপ উদারনীতি প্রচার করিতেন ঃ—

পাখা পাখী সংসার সব
নিপর্খ বিরলা কোই
সেই নিপর্খ হোয়েগা জোকৈ
নাও নিরঞ্জন হোই।

অর্থাৎ জগৎ জুড়িয়া দলাদলি চলিতেছে। এমন লোক অল্পই আছেন যিনি দলাদলির উর্দ্ধে। যিনি জীবনে নিরঞ্জন লাভ করিয়াছেন তিনিই দলাদলি মুক্ত হইতে পারেন।

দাদুর আর একটি উক্তি লক্ষণীয় ঃ—

যহু সব খেল খালিক হরি

তেরা তৈ হি এক করলীলা
দাদূ জপতি জানি কর ঐসী তব
যহূ প্রাণ প'তীলা।

অর্থাৎ হে খালিক ও হরি, এসবই তোমার খেলা, তুমিই নিজেকে সর্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সকলকে ঐক্যবন্ধনে যুক্ত করিয়া লইয়াছ। দাদূ বলেন যে, জগতে তোমার এই লীলা উপলব্ধি করিয়া প্রাণে বিশ্বাস লাভ হইয়াছে।

কবীরের উক্তি অনেকটা এইরূপ ঃ—

এক সমানা সকল মে
সকল সমানা তাহি
কবীর সমানা বুঝি মে
জাহাঁ দোসরা নাহি।

অর্থাৎ —সেই এক সমানভাবে বহুরূপে প্রকট হইয়াছেন। আবার সকল সত্তা তাঁহাতে লয় পাইয়া সমান হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় নাই বলিয়া কবীরের কাছে এখন সবই সমান।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বরাবর ভারতে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বাংলাদেশে এই সমন্বয়-প্রচেষ্টা কিরূপভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহার একটি উদাহরণ দিব। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম লেখক সৈয়দ আকবর "জেবলমুলক শামারুখ" কাব্যে লিখিয়াছেন ঃ—

'বিন এ করিআ বন্দি ফিরিস্তার পদ
ছুন্নিকুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুকুলে নারদ।
তক্ত সিংহাসন বন্দি আল্লার দরবার
হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচার।
পএগম্বর সকলে বন্দি করিআ ভকতি
হিন্দুকুলে দেবতা হেন হইলা প্রকৃতি।
হজরত আদম বন্দি জগতের বাপ
হিন্দুকুলে অনাদি নর প্রচার প্রতাপ।

মা হাওয়া জগত বন্দম জগত জননী
হিন্দুকুলে কালী নাম প্রচার মোহিনী।
হজরত রসুলে বন্দি প্রভু নিজ সখা
হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা।
খোআজ খিজির বন্দম জলেতে বসতি
হিন্দুকুলে বাসুদেব শূন্যে যে প্রকৃতি।
আছাম্বা সকলে বন্দি নবীর সভাএ
হিন্দুকুলে দোওয়াদশ গোপালে ধেয়াএ।
আউলিয়া আম্বিয়া বন্দি রব্বানি কোরান
হিন্দুকুলে মুনিভাব আজ এ পুরান।
পীর মুর্শিদ বন্দম ওস্তাদ চরণ
হিন্দুকুলে গুরু যেন কর এ পূজন।

একদিকে সাধক ও সুফী শ্রেণীর মহান ব্যক্তিগণ, আর অপরদিকে কবি শিল্পিগণ সকলেই বিভিন্ন দিক দিয়া ধর্মকে উদার দৃষ্টিতে দেখিবার ও দেখাইবার এবং বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্মকে কেবল বহিরাচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে শিখিলে ধর্ম সম্বন্ধে উদার ভাব জাগিতে পারে না। যে আদর্শ সে যুগের সাধক ও কবিদের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা হইতেছে ভক্তির আদর্শ। তাঁহারা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের কথা ভাবিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য দেখা যায় যে, হিন্দু সাধকের নিকট মুসলমান দীক্ষা লইয়াছে। আবার অনেক হিন্দু মুসলমান সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা যখন নিজ নিজ সমাজের সহিত মেলামেশা করিয়াছে, তখন নিজেদের ধর্মবোধ দ্বারা সমাজকে অনেকটা প্রভাবিত করিয়াছে। ইহা সর্বজনবিদিত কথা যে, শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট কয়েকজন মুসলমান দীক্ষা লইয়াছিলেন। আবার কবীরের শিষ্যের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা কম ছিল না। আজমীরের হোসেনী পণ্ডিতগণের অস্তিত্ব আজিও বিদ্যমান আছে। লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের কতকগুলি নীতির সহিত ইসলামের সাদৃশ্য আছে। রামানন্দ, দাদু, নানক, তুকারাম ইঁহারা হিন্দু-মুসলমানের আধ্যাত্মিক গুরুর মর্যাদা পাইয়াছিলেন। এইসব সাধক একটা

কথা দ্বিধাহীনভাবে প্রচার করিতেন যে, আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের বড় কথা নহে। তাঁহারা ন্যায়, সততা, ভক্তি, সাম্য ও সৎজীবনের উপর গুরুত্ব প্রদান করিতেন। মনের সৌন্দর্য সাধন ছিল তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। ধর্ম সম্বন্ধে এই উদার মতবাদের কারণেই উভয় সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরিয়া পাশাপাশি শান্তির সহিত বসবাস করিতে পারিয়াছেন। অতীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোথাও কোনও রূপ ঝগড়া বিবাদ হয় নাই, একথা বলি না। কিন্তু সে যুগে ব্রিটিশ যুগের মত জঘন্য ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি জাগ্রত হয় নাই অথবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয় নাই।

মধ্যযুগের মুসলমানদের আদি বাসভূমি যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁহারা ভারতবর্ষকেই নিজেদের মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারতের জীবন-ধারার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের সুখ-দুঃখের সহিত নিজেদের জীবনকে জড়িত করিয়াছিলেন। ভারতের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ভাস্কর্য সবই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি ধর্মের মধ্যে যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। ফলে সমস্ত জীবন-দর্শনের মধ্যে একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিয়াছে। জীবনযাত্রার পদ্ধতিও অনেকটা একই রূপ হইয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দীর সংযোগ, সহযোগিতা ও মিলনের ফলে হিন্দু-মুসলামানের মধ্যে বাহিরের আকারগত চালচলনগত সমন্বয় সাধন হইয়াছে। দুই-চারটি পারিবারিক শব্দ ব্যতীত কথ্যভাষার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে। দুইজনের পরস্পরের কথাবার্তার মধ্যে ধর্মের পার্থক্য কেহ সহজে ধরিতে পারিবে না যাহাকে আমরা বলি কুসংস্কার (superstition) তাহা সাধারণত আদিম সংস্কারের ক্রমবিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত বহু কুসংস্কার একই রূপ। এইসব কুসংস্কার হইতে বুঝা যাইবে যে কত গভীরভাবে সমন্বয়ের কাজ সফলতা অর্জন করিয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দিবে আর নিবে,...যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" ইহাই হইতেছে ভারতের শাশ্বত নীতি। বহুর মধ্যে একের বিকাশ, আবার একের মধ্যে বহুর প্রকাশ, এই নীতি কেবল ভারতবর্ষে সম্ভব হইয়াছে। ভারতের হিন্দু নবাগত মুসলমানকে ফিরাইয়া দেয় নাই। তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। সেজন্য হিন্দুকে বহু জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করিতে

হইয়াছে। তবুও সে ভারতের শাশ্বত নীতি বিসর্জন দেয় নাই। আবার মুসলমান যখন এদেশে আসিয়াছে, তখন সেও তাহার বহুকিছু খাইবার গিরিপথের অপর পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া ভারতের বহুকিছুকে বেমালুম গ্রহণ করিয়াছে। আজ যদি সে বলে, তাহারা স্বতন্ত্র জাতি, তবে সাতশত বৎসরের সমগ্র ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হইবে। ভারতবর্ষ মুসলমানকে অংগীভূত করিয়াছে আর মুসলমানও ভারতকে তাহার সর্বস্ব দান করিয়াছে। এই নেওয়া দেওয়ার মধ্যে ইতিহাসের জয়যাত্রা অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে। রাজনৈতিক কারণে ভারত বিভক্ত হইলেও এ সমন্বয়ের ধারা কোথাও থামিবে না।

কোরান চর্চায় বিনোবাজী

ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরনশরীফ সম্বন্ধে নানাভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এইসব গ্রন্থে কোন কোন লেখক কোরআনের প্রশংসা করিয়াছেন। তার মধ্যে তাহারা পাইয়াছেন অজস্র মণিমুক্তার সন্ধান। আবার কোন কোন লেখক কোরআনের নিন্দা করিয়াছেন। কাহারও নিন্দা ও প্রশংসার উপর কোরআনের মহিমা নির্ভর করে না। এই মহাগ্রন্থ তার অন্তর্নিহিত নিজস্ব মহিমার দ্বারাই কালজয়ী হইয়া রহিবে। সাম্প্রতিককালে আচার্য বিনোবা-ভাবে পবিত্র কোরআনের কয়েকটি শ্লোক সংকলন করিয়া একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরাজীতে তার নাম The Essence of the Quran উর্দুতে তার নাম 'রুহুল কোরআন'। এবং পরিকল্পনা আছে যে তার একটি বাংলা সংস্করণ বাহির করা হইবে তার বাংলা নাম 'কোরআন সার'।

বিনোবাজীর মত মহান ব্যক্তি বর্তমান যুগে পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল। তিনি একজন সাধুপুরুষ। অতীতযুগের সাধুসন্তদের সমস্ত লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখিতে পাই। তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সর্বধর্মে বিশ্বাসী। মাহাত্মা কবীরের মত তাঁকেও সকল ধর্মের লোক নিজেদের লোক বলিয়া মনে করে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার গন্ডী অতিক্রম করিয়া যাহারা বিশ্ব ধর্মের আদর্শে উপনীত হইয়াছেন তিনি তাঁহাদেরই অন্যতম মহামানব। তাঁর মত সর্ব ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ যে কোন ধর্ম সম্বন্ধে যাহাই লিখুন না তাহা হৃদয়গ্রাহী নিরপেক্ষ, ভাবঘন সহানুভূতি ও আন্তরিকতা-পূর্ণ হইবেই। এইসব মহামানব প্রত্যেক ধর্মকেই ভক্তের চোখ দিয়া দেখেন। এবং সেই দৃষ্টিভংগী দিয়াই ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। বিনোবাজী কোন ধর্মকেই ছোট সঙ্কীর্ণ ও অনুপযুক্ত মনে করেন না। তাঁর নিরপেক্ষ

ও উদার দৃষ্টিতে সকল ধর্মই সত্য। সকল ধর্মই একই ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি মনে করেন যে যদি প্রত্যেক মানুষ নিজের বিশ্বাস, বুদ্ধি বিবেচনা ও বিবেক অনুসারে সঠিকভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে তবে তার আত্মা শুদ্ধ হইবে, এবং ধর্ম লইয়া পৃথিবীতে কোন গণ্ডগোল হইবে না। গণ্ডগোল হয় তখনই, যখন কোন ব্যক্তি মনে করে যে তার ধর্ম ব্যতীত আর সকল ধর্মই মিথ্যা ও ভ্রান্ত। কিন্তু বিনোবাজী বলেন যে মানুষ যদি ঠিকভাবে নিজের জন্মগত ধর্মপালন করিয়া চলে তবে সে নিশ্চয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ উদার মত যিনি পোষণ করেন ও প্রচার করেন, তিনি কখনও কোন ধর্মের তথা ধর্মগ্রন্থের ছিদ্র অনুসন্ধান করিবার জন্য গ্রন্থ রচনা করিতে বসিবেন না। তাঁর পক্ষে কোন ধর্মের নিন্দা করা অসম্ভব। বরং তিনি ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করবেন যে. সকল ধর্মই সত্য, সকল ধর্মেই মুক্তি আছে এবং মানুষকে পূর্ণতা দিতে পারে। বিনোবাজী নিজে যাহা বুঝিয়াছেন, জনসাধারণকে তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করেন। একটা মহৎ উদ্দেশ্য প্রনোদিত হইয়াই বিনোবাজী 'রুহুল কোরআন' বা কোরান সার গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হইলে পাঠকগণ, বিশেষ করিয়া মুসলিম পাঠকগণ দেখিয়া আনন্দিত হইবেন যে, ইহা সেল, রডওয়েল প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখকদের অনূদিত কোর-আনের মত নহে। আরও দেখিবেন যে, অমুসলমান সমাজের মধ্যে কোরআনের ভাব চিন্তা প্রসারের পক্ষে ইহা একটি অভিনব ও অমূল্য গ্রন্থ।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, পাকিস্তানে কতিপয় অঞ্চলে বিনোবাজীর এই মূল্যবান গ্রন্থ লইয়া নানারূপ বিরূপ ও আজগুবি আলোচনা হইয়াছে। পদযাত্রার মাধ্যমে পাকিস্তান ভ্রমণের প্রাক্‌কালে বিনোবাজী সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ও প্রতিকূল ধারণা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই সেখানকার কতিপয় সংবাদপত্র বিনোবাজীকে আক্রমণ করিয়া হৈ চৈ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁরা এই গ্রন্থটি না পড়িয়াই এবং ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ সঠিক সংবাদ সংগ্রহ না করিয়াই প্রচারণা আরম্ভ করিলেন যে বিনোবাজীর গ্রন্থটি ইসলাম বিরোধী। সেখানকার দুএকটি সংবাদপত্র বিনোবাজীর "কোরান সার" গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করিয়া এমনভাবে সংবাদ পরিবেশন করিলেন যে, তাহাতে পাঠকদের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।

তাঁহারা পাকিস্তানের পাঠকগণকে জানাইলেন যে, বিনোবাজীর বইটি 'is edited rearranged and omitted.' এই ধরনের ভ্রান্ত মন্তব্যযুক্ত সংবাদটি প্রকাশ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য বিনোবাজী সম্বন্ধে সাধারণ মুসলমান-দের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা। কিন্তু আসল ব্যাপার মোটেই সে সবকিছু নহে। বিনোবাজী "কোরান সার" গ্রন্থটি যেভাবে রচনা করিয়াছেন তাহাতে উহাকে re-arranged ও omitted বলা যায় না। সে কথা উঠিতেই পারে না। তিনি কোরান শরীফের কতকগুলি মূল্যবান শিক্ষা ও উপদেশকে একটি গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন। এবং এক একটি বিষয় অনুসারে কোরআনের উপদেশকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাতে আছে কোরআনের মূল শ্লোক আর তার প্রাথমিক অনুবাদ। বস্তুতঃ বিনোবাজীর গ্রন্থ কোরআনের নতুন কোন অনুবাদ, টিকা বা ভাষ্য নহে। ইহা কতকগুলি মূল্যবান শিক্ষার সঙ্কলন মাত্র।

পাকিস্তানের সংবাদপত্রে বিনোবাজীর 'কোরান সার' গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহা একেবারেই ভ্রান্ত। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের কেহই গ্রন্থটি দেখেন নাই, পড়া তো দূরের কথা। কারণ তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। যাঁহারা বিনোবাজীর গ্রন্থের উর্দু সংস্করণ 'রুহুল কোরআন' দেখিয়াছেন তাঁদের মধ্যে একজনের কথা উল্লেখ করিব। তাঁর নাম জনাব চৌধুরী মহম্মদ শফী। তিনি কাশ্মীরের লোক। এই সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে তিনি ভারতীয় লোকসভার সদস্য ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে বিনোবাজীর গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন ও পড়িয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি সম্প্রতি একটি বিবৃতি দিয়াছেন। যদি কোন লোকের মনে বিনোবাজীর গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয় তবে শফী সাহেবের বিবৃতি তাহা দূর করিয়া দিবে। তাঁর সেই বিবৃতিকে ভিত্তি করিয়া কয়েকটি কথা বলিব।

শফী সাহেব বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে তিনি স্বচক্ষে বিনোবাজীর গ্রন্থটি দেখিয়াছেন। এই গ্রন্থে বিনোবাজী কোরআনের কতকগুলি মহান শিক্ষাকে বিষয় অনুসারে বিভক্ত করিয়া জন সাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহাতে কোরআনের শ্লোকের যে সব অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা বিনোবাজী standard অনুবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দী,

গুজরাটী এবং অপরাপর ভাষায় ইহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা বিনোবাজীর আছে। এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নে বিনোবাজীর প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনের সর্বজনীন শিক্ষাকে সকল সম্প্রদায়ের লোকের সামনে উপস্থিত করা। তাহারা যেন সহজেই কোরআনের আসল শিক্ষাগুলি পাইতে পারে এবং তার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারে। আমরা মনে করি কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে এই ধরনের সঙ্কলন করা মোটেই দোষের নহে। বরং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ যুগে মস্ত একটা ট্রাজেডি যে এক ধর্মের লোক অপর ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না। আর যদি কিছু জানে তবে তাহা এত ভ্রান্ত ও একদেশদর্শী যে সে জ্ঞান দ্বারা অপর ধর্ম সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা জন্মে না। বিশ্বমানব বিনোবাজী সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন। তাঁর জীবনের অন্যতম মৌলিক নীতি উপদেশগুলি উপস্থিত করিতে চান। যেন সাধারণ লোকের অন্তর হইতে ধর্মবিদ্বেষ চিরতরে দূর হইয়া যায়। যেন মানুষ বুঝিতে পারে যে বিভিন্ন ধর্মের মূল শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য ও বৈরীভাব নাই। তাই আজ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিব যে বিনোবাজীর 'রুহুল কোরআন' সম্বন্ধে পাকিস্তানের সংবাদপত্রে যে সব প্রচার করা হইয়াছে তাহা সত্য নহে, তাহা ভ্রান্ত। দুষ্ট উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই এই ধরনের সংবাদ পরিবেশন করা হইয়াছে। আরও বলিব যে বিনোবাজী উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া খুব ভাল কাজ করিয়াছেন। এ ধরনের পুস্তক বর্তমানে বাজারে নাই। সুতরাং উহার দ্বারা মুসলমান অমুসলমান সকলেই উপকৃত হইবে।

বিনোবাজী সম্বন্ধে সম্যক তথ্যের অভাববশতঃ অনেকেই আজগুবী ধারণা করিয়া থাকে। একথা সকলের জানা দরকার যে বিনোবাজী বেদ, উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, কোরআন, ধম্মপদ ও অপরাপর ধর্মগ্রন্থ গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পাঠ করিয়াছেন। সমালোচক অপেক্ষা ভক্তের দিক দিয়াই তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। তিনি সাত-আটটা ভাষা জানেন। যে প্রদেশেই যান সেই প্রদেশের ভাষাও কিছু কিছু শিখেন। তিনি আরবী ভাষাও জানেন। মূল আরবী আয়াতের অনুবাদ করতে পারেন। তাছাড়া কোরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণও তিনি করতে পারেন। যিনি বিশুদ্ধ করিয়া কোরআন পাঠ করিতে পারেন তাঁহাকে বলা হয় কারী। জনাব কারী মহম্মদ ইউসুফ অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে বিশুদ্ধ করিয়া কোরআন পাঠ করিতেন।

বিনোবাজী কুড়ি বৎসর ধরিয়া গভীর মনোযোগ সহকারে উক্ত কারীর ও অন্যান্য কারীর কোরআন পাঠ রেডিওতে শুনিতেন। তাহা শুনিয়া শুনিয়া নিজের আরবী উচ্চারণকে সঠিক করিয়া লইতেন। তাছাড়া তিনি বহু বৎসর গভীরভাবে কোরআন পাঠ করিয়াছেন, কোরআনের নানাপ্রকার বিশ্বাস্য ও প্রামাণিক ভাষ্য ও টীকাও পাঠ করিয়াছেন। মওলানা আজাদের কোরআনের ভাষ্যও তিনি পাঠ করিয়াছেন। এইভাবে তিনি কোরআন সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন। তিনি নিজেই অপরের সাহায্য না লইয়া কোরআনের বিভিন্ন শ্লোকের অনুবাদ করিতে পারেন। মওলানা আজাদ বিনোবাজীর কয়েকটি অনুবাদের প্রশংসা করিয়াছেন। এমন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি কোরআনের কোন সঙ্কলন করেন তবে তাঁহাকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লওয়া উচিত।

বিনোবাজী বহু বৎসর ধরিয়া বহু দিক দিয়া কোরআন পাঠ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া কোরআন পাঠের পরিণতি এই 'রুহুল কোরআন'। এই গ্রন্থের বিষয় অনুসারে বিভিন্ন শিরোনাম দিয়া কোরআনের শ্লোক-গুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্তমান যুগে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন জাগরিত হয়। সেই সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইতে পারে যে-সব শ্লোকে, এই গ্রন্থে সেগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কি কি বিষয় গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহার দু'একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ তৌহিদ বা আল্লাহের একত্ব। তারপর আজে আজে রিসালাত অর্থাৎ প্রেরিত পয়গম্বরত্ব। তারপর আছে ঐশ্বরিক প্রেরণার কথা। অন্য একটা শিরোনামায় আছে কিতাবুল্লাহ বা ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্মগ্রন্থ। পরবর্তী অধ্যায়ে আছে দৈনিক শিক্ষা, প্রার্থনা, সংসার ধর্ম ইত্যাদি। এইসব বিষয় সম্পর্কে কোরআন শরীফ কি বলেন, তাহাই বিনোবাজী কোরআন হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতে আছে প্রায় একশতটি বিষয়ের শিরোনামা। সমগ্র কোরআন হইতে শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে বহু পড়াশুনা করিতে হইয়াছে।

ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে বিনোবাজী সমগ্র কোরআনের তফসীর বা ভাষ্য রচনা করেন নাই। তিনি কোরআনের যে সব অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অনুবাদও অধিকাংশ স্থলে নিজে করেন নাই। মুসলিম সমাজে যে সব standard অনুবাদ প্রচলিত ও স্বীকৃত আছে তিনি তাহা

হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণে মার্মাডিউক পিক্‌টহলের কোরআনের অনুবাদগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পিক্‌টহল সাহেব নিজে মুসলমান। তিনি আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত। দেশ বিভাগের পূর্বে হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশিত Islamic Culture-এর সম্পাদক ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত বহু মুসলমানের ঘরে পিক্‌টহল সাহেবের অনুবাদটি সযত্নে পঠিত হয়। বিনোবাজী তাঁর গ্রন্থের উর্দু সংস্করণে কোরআনের যে অনুবাদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহাতে তিনি শেখুল হিন্দ মওলানা মাহবুবুল হাসান ও মওলা আশরফ আলী খানচুমি প্রমুখ আলেম-গণের গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিনোবাজীর এই গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বিনোবাজী কোরআনের বিভিন্ন অংশ হইতে সংগ্রহ করিয়া যে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা তো কোন নূতন জিনিস নহে। বিগত তের বৎসর ধরিয়া বহু আলেম কর্তৃক উক্ত প্রকার সঙ্কলন প্রস্তুত হইয়াছে। এই ধরনের সঙ্কলনের নিজস্ব একটা মূল্য ও সার্থকতা আছে। এরূপ সঙ্কলনের কয়টি উদাহরণ দেওয়া যাক। সৈয়দ আমির আলির Ethics of Islam এই ধরনের সঙ্কলন পুস্তক। মওলানা নজির আহমদ সাহেব লিখিত 'আলহকুক ফারায়েজ" গ্রন্থখানিও এই উদ্দেশ্যে রচিত। ডাঃ আব্দুল লতিফ কর্তৃক লিখিত The mind that al-Quran Builds ও এই ধরনের সঙ্কলন গ্রন্থ। লাহোর হইতে 'নুস্‌খায়ে কিমিয়া' গ্রন্থটি সংকলন ব্যতীত আর কিছুই নহে। দিল্লীর মওলানা আতাহার হোসেনের Glimpses from Al Quran ইহাও বিনোবাজীর মতই সংকলন গ্রন্থ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিনোবাজীর গ্রন্থ কোন দিক দিয়াই নূতন নহে।

ধর্মগ্রন্থ হইতে এই ধরনের সংকলনের উদ্দেশ্য হইতেছে ধর্মের বাণীকে সহজলভ্য করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা।

এ যুগের মানুষের অশান্ত বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত মনকে বিনোবাজীর মত মহামানবের উপদেশ শান্ত করিতে সাহায্য করিবে। তিনি এই কোরআনের সঙ্কলনে যে আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও দরদ দেখাইয়াছেন তাহা অন্য কেহ দেখাইতে পারিবেন না। বিনোবাজীর কণ্ঠে ইসলামের বাণী অপূর্ব শুনাইবে। যে কোন লোক ইহা পাঠ করিবে সে-ই ইহার দ্বারা উপকৃত

হইবে। এতাবৎ তিনি তিনটি ধর্মগ্রন্থ সঙ্কলন রচনার পরিকল্প করিয়াছেন। একটি গীতা প্রবচন, দ্বিতীয় কোরআনের সার এবং তৃতীয় গ্রন্থ হইতেছে ধম্মপদ। ইহার পর তিনি বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ হইতে এই ধরনের সংকলন রচনা করিতে চান। এইসব গ্রন্থ রচনায় তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে পৃথিবীর ধর্মসমূহকে তিনি সাধারণ লোকের নিকট সহজ বোধ্যভাবে উপস্থিত করিবেন, যেন অল্পশিক্ষিত লোক ধর্মের সারসত্য উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

কোনও ধর্ম কাহারও ব্যক্তিগত একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। ঈশ্বরের বাণী সকলের জন্য। প্রত্যেক মানুষ তাহা হইতে প্রেরণা পাইতে পারে। প্রত্যেকের তাহা পড়িবার ও ব্যাখ্যা করিবার অধিকার আছে। বিনোবাজী ত সকল ধর্মকে ভালবাসেন। তাঁহার কণ্ঠে যদি ইসলামের কথা শুনি তবে তাহাতে আপত্তি করিবার কি আছে? বরং এই কথা বলিব যে বিনোবাজীর কণ্ঠে ইসলামের বাণী যখন শুনি তখন নূতন করিয়া ইসলামকে বুঝিবার চেষ্টা করি। আমিও মনে করি কোরআনের সারগ্রন্থ রচনা করার জন্য সমস্ত মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে বিনোবাজীকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তিনি এমন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যাহার অনুবাদ প্রত্যেক ভাষায় হওয়া উচিত। তাঁহার এ গ্রন্থ দ্বারা ইসলামের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই বরং ইসলামের গৌরব মহিমাই ঘোষিত হইয়াছে।

ফারসী চর্চায় হিন্দু সুধী

বিশ্বকবি বলেছেন, "শকহূনদল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন।" ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাস পাঠ করলে বোঝা যাবে, বিশ্বকবির কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। বস্তুতঃ ভারতীয় সভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—সমন্বয়। এখানে হাজার হাজার বছর ধরে নানা ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে এবং কালক্রমে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

ইউরোপের ইতিহাসে দেখি, সেখানেও সমন্বয় হয়েছে, কিন্তু ভারতের মত নয়। ইউরোপ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে চূর্ণ করে ভেঙে দিয়ে এক রূপতার সমন্বয় গড়ে তুলেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ বিভিন্নতাকে ও বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে নি, বরং বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় রচনা করেছে।

ভারতে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বিভিন্ন দেশ থেকে নানা জাতি এসেছে, তারা ভারতের নিকট থেকে নিয়েছে বহু বিষয়, আবার দিয়েছেও বহু। যখন দুর্বার বেগে মুসলমানগণ ভারতে এল, তখন মনে হয়েছিল, সব বুঝি ভেঙে চুরে একাকার করে দেবে। তারা চারিদিকে রাজ্যবিস্তার করেছে, অনেক কিছু ধ্বংস করেছে, কিন্তু তাদের সাতশ বছরের ইতিহাস কেবল একটানা ধ্বংসের ইতিহাস নয়, সেই ইতিহাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে সংস্কৃতি সমন্বয়ের ইতিহাস; কেউ কাউকে গ্রাস করে নি, একের মধ্যে অপরের প্রভাব অদ্ভুতভাবে সঞ্চারিত হয়েছে।

আমাদের দেশে একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন সমন্বয় হয়নি; বা ভবিষ্যতেও হবে না। কিন্তু যদি মধ্যযুগের সংস্কৃতির ইতিহাস পাঠ করি, তবে দেখে স্তম্ভিত হব যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদান হয়েছিল, এবং তার ফলে কিছুটা সমন্বয়ও সাধিত হয়েছিল।

মুসলিম বিজয়ের অব্যবহিত পরেই আমরা দেখি মনীষী আলবেরুণীকে। আলবেরুণী হচ্ছেন সে-যুগের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রধান সেতু। তাঁর মত পরে আরও বহু মুসলিম পণ্ডিত ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা আরব দেশে এবং সেখান থেকে পাশ্চাত্যে ভারতের কথা প্রচার করেন। আরবের বহু সুধী ভারতীয় দর্শন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আরবীতে অথবা ফারসীতে অনুবাদ করেছিলেন। এইভাবে "নিকট প্রাচ্যের" (Near East) নানা অঞ্চলে ভারতের জ্ঞান ও দর্শন প্রচারিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভারতীয় কৃষ্টির ভাব (spirit of culture) আরব দেশের গভীরতর প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, ভারতের বহু মূল্যবান গ্রন্থ আরবী-ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত— এই সবের অনুবাদ হয়েছে আরবী ও ফারসী ভাষায়। সংস্কৃত হিতোপদেশের ফারসী নাম "আনোয়ার সোহেলা"। এই গ্রন্থ আবার আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, তার আরবী নাম "কালিলা ও দামনা"।

আরবের বহু খলিফা, বাদশাহ ও শাসকগণ আরবদেশ ও বহির্বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে একই স্থানে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সে জন্য অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন নি। যুক্তি ও দর্শনের ভিত্তিতে একটা নবতর সভ্যতা গঠনের প্রতি তাঁদের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁরা জানতেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক মিলন ঘটাতে হলে তাদের দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা দরকার। মূলগ্রন্থ থেকে জ্ঞান আহরণ না করলে নিরপেক্ষভাবে দর্শন বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হতে পারে না, সেইজন্য সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য একশ্রেণীর মুসলিম সুধী অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখি, মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলিম পণ্ডিতগণ পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। মুসলিম পণ্ডিতগণ যেমন সযত্নে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, সেইরূপ হিন্দু পণ্ডিতগণও আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করতে কুণ্ঠিত হন নি। কিছু সংখ্যক হিন্দু পণ্ডিত-মুসলিম "কালচার" সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শুধু সংস্কৃত ভাষায় নয়, ফারসী ও আরবী ভাষাতেও তাঁরা বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকজন হিন্দু সুধীর কথা বলব, যাঁরা আরবী অথবা ফারসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে-সব গ্রন্থের জন্য তাঁরা এত খ্যাতি অর্জন করেন যে ভারতের বাইরেও তাঁদের গ্রন্থের সমাদর হয়েছিল। তা থেকে বোঝা যাবে যে, সে-যুগে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারাটা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।

বৃটিশদের ভারতে আগমনের বহু শত বৎসর পূর্ব থেকে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির আদান-প্রদান হয়ে আসছিল। যে-সব হিন্দু সুধী আরবী ও ফারসীতে পুস্তকাদি রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের সংখ্যা অগণিত। তাঁরা ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে ফারসী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতের মুসলিম ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

ভারতে বৃটিশ-শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে ফারসী ছিল রাষ্ট্রভাষা। সরকারী কাজের জন্য হিন্দু-মুসলমানের অনেকেই ফারসী ভাষা শিখতেন, কিন্তু সেটা ছিল স্বতন্ত্র বিষয়। রাজকার্য পরিচালনার জন্য যতটুকু ফারসী শিখতেন, তাতে সাহিত্যিক জ্ঞান হত না। সাহিত্যের ভাষা হিসাবে যাঁরা ফারসী শিখতেন, তাঁদের শিক্ষাই ছিল আসল শিক্ষা।

শত শত হিন্দু সুধী ছিলেন, যাঁরা সাহিত্যকে ভালবাসতেন বলে সংস্কৃত ভাষার মতই ফারসী শিখতেন। ইসলামিক জগতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁরা ফারসী ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য সাধনা করতেন। বহু হিন্দু কবি, দার্শনিক ও শিল্পী ছিলেন, যাঁরা যে কোন ফারসী-ভাষী পণ্ডিতের মত সহজ-স্বচ্ছন্দভাবে ফারসী লিখতে পারতেন। ইসলাম-সম্বন্ধে-বহু গ্রন্থ তাঁরা ফারসী ভাষাতেই লিখে গেছেন। কেউ কেউ আবার আরবীতে লিখেছেন। এইসব লেখক-গোষ্ঠী হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কাজকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছেন।

বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর এ দেশে একটা অপপ্রচার করা হয়েছে, যার ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জাগ্রত হয়ে উঠেছে। সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে ইতিপূর্বে যে সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছিল, এইসব অপপ্রচারের ফলে সেটা অনেকটা ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগে যেসব হিন্দু-মুসলমান সুধী ফারসী ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতেন, তাঁরা ছিলেন সে-যুগের সংস্কৃতি সমন্বয়ের মশালবাহী সাধক। তাঁরা যে-স্রোত

বইয়ে দিয়েছিলেন, তা যদি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত থাকত, তবে ভারতের অবস্থা অন্যরূপ হ'ত, এইসব সাধকদের জীবনের ব্রত সার্থক হ'ত এবং বহুপ্রকার জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। এই প্রবন্ধে কেবল কয়েক-জন হিন্দু সুধীর কথা বলছি, যাঁরা অতীত যুগে ফারসী ভাষায় চর্চা করেছিলেন এবং সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করতে সহায়তা করেছিলেন।

প্রথমেই ফারসী ভাষায় লিখিত একটি পুস্তকের নাম করা যাক— "গুলরানা"। এটা কবিদের জীবনীমূলক একটি গ্রন্থ। লেখকের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ। তাঁর কবি নাম "শফীক"। লক্ষ্মীনারায়ণের আদি বাসস্থান আহ্মদাবাদ। তাঁর "গুলরানা" গ্রন্থে একটি অধ্যায়ে আছে ভারতীয় কবিদের বিবরণ; অপর অধ্যায়ে মুসলিম কবিদের পরিচয়; আর এক অধ্যায়ে সেই সব হিন্দু কবিদের বিবরণ আছে, যাঁরা ফারসী-ভাষায় কাব্য-চর্চা করেছেন।

লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ আসলে একজন ঐতিহাসিক। তিনি ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের একটি ইতিহাস লিখেছেন। তাঁর সে-ইতিহাস-গ্রন্থের নাম "হাকিকাতে হিন্দুস্থান"। এই পুস্তকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্ব-ব্যবস্থার-কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর রচিত আর একটি পুস্তকের নাম "মাসার ই-আসাদী"। এতে আছে ১৬৭১ থেকে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হায়দ্রাবাদের ইতিহাস। এসব ঐতিহাসিক গ্রন্থের একটা নিজস্ব মূল্য আছে সত্য, কিন্তু "গুলরানা" তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, আকবরের রাজত্বকালে ভারতে বহুসংখ্যক কবির আবির্ভাব হয়েছিল, সেই যুগের একজন বিখ্যাত হিন্দু কবি ছিলেন তাঁর নাম "মনোহর তানসানি"। মনোহর তানসানি ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি কাব্য-রাজ্যের সিংহাসনকে চতুষ্পদী কবিতার শ্লোক দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন।

শাহজাহান ও আলমগীরের রাজত্বকালে "ব্রাহ্মণ-লাহুরী" ব'লে একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি একটি "দেওয়ান" লেখেন, তাতে তাঁর রচিত বহুবিধ কবিতা সঙ্কলিত আছে। মোগল সম্রাট শাহআলম, ফারোকশিয়ার ও মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে বহু হিন্দু কবি কাব্য রচনা ক'রে অশেষ কীর্তি

অর্জন করেন। তাঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ভারতীয় পট-ভূমিকার উপর ফারসী কবিতা লিখতেন। "গুলরানা'র লেখক লক্ষ্মীনারায়ণ আরও কয়েকজন হিন্দু-কবির নাম উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তাঁদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল ঃ

১। অচল দাস ঃ তিনি জাহানাবাদের অধিবাসী, জাতিতে ক্ষত্রিয়। অচলদাস ছিলেন স্বভাবকবি। তাঁর কবিতার একটি নমুনা ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে দেওয়া হল। এই ইংরাজীর বাংলা অনুবাদ দিলাম না; কারণ তাতে "সাত নকলে আসল খাস্তা" হয়ে যাবে।—

"I did not see any place void of the splendour of the traceless one ; the six directions are full to the brim with His beauty, while His space is vacant—He being not inclined to any particular space.

২। কিশন চাঁদ ঃ ইনি এখলাস এই কবি-নাম নিয়ে কাব্য চর্চা করতেন। কিশনচাঁদ উপরিউক্ত অচল দাসের পুত্র। তিনি মীরজা আব্দুল চাদী ও আবদুল কাশ্মীরীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। কিশনচাঁদ ছিলেন সুন্দরের কবি। জীবনে প্রথম শ্রেণীর বহু কবির সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনিও একটি স্মৃতিকথা লিখেছিলেন। সেই গ্রন্থের নাম "হামেশা বাহার" অথবা "চিরবসন্ত"। তাঁর এই গ্রন্থ থেকে দুএকটি শ্লোকের অনুবাদ ঃ

"When the heart is overcome with love, reason vanishes, When the king is defeated, the courage of the army vanishes."

"Art and skill is a sufficient sign for a clever man. The name of a sage subsists through his thought and idea. Do not be perplexed, O Ekhlas, for attaining eminence, for the ups and downs of the world are like a ladder."

৩। আনন্দকন ঃ তাঁর আসল নাম বৃন্দাবন। তিনি ফারসী ও সংস্কৃত দুই ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুললিত ভাষায় সমগ্র গীতার ফারসী অনুবাদ করেন। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ইংরেজী অনুবাদেও পরিস্ফুট ঃ

The pillow is drenched throughout the night with
my tears,

The rose-petals become sparks of fire on my bed
The slumber comes asd sees water in my eyes,
She fears being drowned, so turns back.

৪। উলফৎ লালা অজাগর চাঁদ ঃ ইনি মথুরার এক বিখ্যাত কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, অল্প আয়ে দিনপাত করতেন। তাঁর সহজ ব্যবহার, নম্র স্বভাব সকলকে মুগ্ধ ক'রে তুলত। প্রথম জীবনে তাঁর কবি-নাম ছিল "গুরবৎ" অর্থাৎ দারিদ্র্য। কিন্তু পরে, তিনি ঐ নাম পরিবর্তন ক'রে "উলফৎ" এই নাম গ্রহণ করেন। তাঁর রচনা মধুর ও প্রীতিপ্রদ। নিম্নের উদ্ধৃতি তাঁর রচনা মাধুর্যের পরিচয় দেবে ঃ

In the evening there came int › my bosom a guest named "grief",
Unceremoniously I placed a fray before him from the strain of my heart,
My heart is becoming intoxicated with "Kaaba" of the black eyes,
For it possesses a hundred pitchers of wine of pleasure of this night.

৫। ব্রাহ্মণ রায় চন্দ্রভান ঃ এঁর জন্মভূমি লাহোর। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবি। তিনি কিছুদিন মোগল সম্রাট শাহজাহান ও তৎপুত্র দারা শিকোহের সেক্রেটারীর কাজ করেছিলেন। দারা যখন কোন সংস্কৃত গ্রন্থকে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করতেন, তখন তিনি কবি চন্দ্রভানের নিকট বহু সাহায্য গ্রহণ করতেন, দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা তাঁর নিকট বুঝে নিতেন। এমন কি দারা তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থে চন্দ্রভানের ফারসী শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ফারসী ভাষায় অনেক বই লেখেন, তন্মধ্যে দুটি গ্রন্থ সুবিখ্যাত ঃ

(১) "মুনশা আতে ব্রাহ্মণ"—তিনি শাহজাহান ও তাঁর দরবারের কয়েকজন ওমরাহকে যেসব চিঠি লিখেছিলেন, এতে আছে সেই সব চিঠির সংকলন।

(২) "দিওয়ান-ই-ব্রাহ্মণ"—এটা একটা কবিতার সংকলন। তিনি যে

সব কবিতা লিখেছিলেন, বর্ণনানুসারে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে এই কাব্য-গ্রন্থে। তাঁর কবিতা সে যুগে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

৬। কন্‌কা অন্য নাম—কঙ্কা : খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কবি কন্‌কার আবির্ভাব ঘটে। সে-যুগে তিনি একজন পণ্ডিত ব'লে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি আরবী ও ফারসী দুই ভাষাতেই রচনা করতেন। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং সুদূর বাগদাদ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। খলিফা মামুনের দরবারে একজন ভারতীয় পণ্ডিত ব'লে সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হন। জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বহু ভারতীয় গ্রন্থ তিনি বাগদাদে নিয়ে যান এবং অপরাপর পণ্ডিতের সহযোগিতায় সেগুলিকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর এই বিরাট গ্রন্থের নাম "সিন্ধ ও হিন্দ"। কনকা আরবী ভাষায় আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেওয়া গেল : (১) আলমুমুজাফিল আমর—অর্থাৎ জীবনের আদর্শ। (২) কিতাব-ই-আসরার আল মাওয়ালিদ—অর্থাৎ জন্মরহস্য। (৩) কিতাবুল কিরানাতুল কাবির—অর্থাৎ গ্রহ ও উপগ্রহ-সংক্রান্ত গ্রন্থ। (৪) কিতাবুত্ তিব্বেকাশ্‌নাম— এটা চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তক। (৫) কিতাবুল তারাহাম—কল্পনা সংক্রান্ত পুস্তক। (৬) কিতাবুল আহাদিসুল আলাম—এটা পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত পুস্তক।

৭। কেরলরাম : ইনি ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম "তাজকেরাতুল ওরামা"। এতে আছে কতিপয় বিখ্যাত আমীর ও ওমরাহের জীবনীর সংকলন। গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে মুসলিম ওমরাহ্ সভাসদগণের বিবরণ। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে হিন্দু সভাসদগণের বিবরণ।

৮। কিশোরী : তিনি ফারসী ভাষায় বহু কবিতা রচনা করেছেন। পাঠান যুগের তিনি একজন বিখ্যাত কবি ও বহু গ্রন্থের লেখক। তাঁর গ্রন্থগুলি আজকাল একেবারে দুষ্প্রাপ্য। তবে তাঁর রচিত কয়েকটি কবিতা "মাজমায়ে আশার" নামক একটি কবিতা সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে। সেগুলি পাঠ করে জানা যায় যে, তাঁর কবিতা যেমন তেজস্বিতাপূর্ণ, তেমনি প্রাঞ্জল।

৯। নরনারায়ণ : মোগল সম্রাট ফারোখশিয়ারের সময় কবি নরনারায়ণ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সংস্কৃত ও ফারসীতে সুপণ্ডিত

ছিলেন এবং দুটি ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম "গুলশনে রাজ"। সে-যুগের সুধীমণ্ডলী এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা ও দৃশ্যাবলী থেকে গৃহীত। তিনি যেসব দৃশ্যকে তাঁর যুগের পটভূমিকার উপর অপরূপভাবে অঙ্কিত করে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভারতীয় বিষয়ের উপর ফারসী ভাষায় এমন সুন্দর গ্রন্থ অতি অল্পই লিখিত হয়েছে। সুমধুর ফারসী কবিতার এ একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

১০। রায় বৃন্দাবন: ফারসী ভাষায় ইনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তাঁর প্রধান কীর্তি এই যে, তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ "তারিখ-ই-ফিরিস্তা" কে ফারসী ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে লেখেন। সেই সঙ্গে এই গ্রন্থে একটি নূতন অধ্যায় সংযোগ করেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কথা তিনি সবিস্তারে এই অংশে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থের নাম "লুৎবাতুত তাওয়ারিখ"।

১১। শানাক: তিনি ফারসী ভাষায় ঔষধপত্র ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন এবং চিকিৎসার বহু অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁর তিনখানি পুস্তক খ্যাতিলাভ করেছে। (১) "কিতাবুস সুমাম-ফি খামসে মকালাত"—এতে আছে বিষ-সম্বন্ধে আলোচনা। (২) "কেতাবুল বায়ম তারাব"—এতে আছে পশুরোগ-সম্বন্ধে আলোচনা। (৩) "কেতাব ফি ইলমে নুজুম"—এতে আতে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা।

১২। সানজাহাত: দশম শতাব্দীতে ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলে খ্যাতি অর্জন করেন। আল-বেরুণী এঁর ভেষজ-সংক্রান্ত একখানা পুস্তক পড়েছিলেন। ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সানজাহাত অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জন্মরহস্য সম্বন্ধেও একটা গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম "কেতাবুল মোওয়ালিদাল কবির।"

১৩। সুজনরাজ: প্রবন্ধের শেষে আর একজন সুপণ্ডিতের নাম করব—যিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় জীবিত ছিলেন। তিনি প্রাচীন কাল থেকে আওরঙ্গজেবের যুগ পর্যন্ত এই দীর্ঘকালের বিরাট ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন ফারসী ভাষায়। তাঁর সে-গ্রন্থের নাম "খোলাসাতুত তারিখ"। আওরঙ্গজেবের যুগের বহু ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ তাঁর এই গ্রন্থে

আছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নের সময় তিনি বহু ফারসী গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, যথা ঃ "তারিখে আকবর", "জাহাংগীর নামা", "আকবর নামা"।

আরও বহু হিন্দু সুধী ফারসী ভাষায় অসংখ্য-গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। স্থানাভাব বশতঃ বর্তমান প্রবন্ধে তাঁদের নাম ও পরিচয় দেওয়া সম্ভব হ'ল না। বৃটিশ যুগের পর ফারসীর স্থলে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হল ইংরেজী। সুতরাং দেশে ইংরেজী শিক্ষার খুব ধুম পড়ে গেল; আর ফারসী ভাষা অবহেলিত হতে লাগল। তার পর থেকে ফারসী ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। ভারতে হিন্দু চিন্তা ও মুসলিম চিন্তার মধ্যে দীর্ঘকাল থেকে আদান-প্রদান হয়ে আসছিল। ফলে উভয় ধরনের চিন্তাধারা একই মহাসাগরে মিলিত হচ্ছিল। এইভাবে ভারতে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের পথ সুগম হয়ে আসছিল; কিন্তু ইংরেজ অধিকারের পর সে সমন্বয় বন্ধ হয়ে গেল। আবার নূতন উদ্যমে সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারাকে প্রবাহিত করে দিতে হবে। মুসলমানকে যেমন সংস্কৃত-ভাষার চর্চা করতে হবে, সেইরূপ হিন্দুকেও আরবী ফারসীর চর্চা করতে হবে। ভাষার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। আরবী ফারসী চর্চা না করলে ভারতবর্ষ ইরাণ, ইরাক—তথা সমস্ত মধ্য প্রাচ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

দীনে-এলাহি

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে মোগল-সম্রাট আকবরের স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত। ন্যায় পরায়ণ, সুশাসক, বিচক্ষণ ও সমদর্শী রাজা বলিয়া তিনি সর্বত্র সমাদৃত। কিন্তু রাজনীতি ব্যতীত ধর্মনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাঁহার স্থান সামান্য নহে। রাজাধিরাজ আকবর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বহু সংগ্রাম করিয়াছেন, বহু জনপদ অধিকার করিয়াছেন, বহু মানবকে শৃঙ্খলিত করিয়া আপনার গৌরব-গরিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু অন্যদিকে সাধক আকবর নীরবে গৃহকোণে পণ্ডিতমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া দিনের পর দিন সাধনা করিয়া যে অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত সাম্রাজ্য অপেক্ষাও মূল্যবান ও স্থায়ী। আজ আকবরের যোজনব্যাপী সাম্রাজ্যের চিহ্নমাত্র নাই। কালের কুটিল আক্রমণে মোগলের গগনচুম্বি গর্ব ও মহিমার নিদর্শন ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বংশধরগণ আজ কোথায় কী অবস্থায় আছেন কেহই তাহার সংবাদ রাখে না। কিন্তু মহামতি আকবর সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্য এবং মানবের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য এমন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যাহা আজিও বহুজনকে প্রেরণা যোগাইতেছে। শতাব্দীর গাঢ় তিমির ভেদ করিয়া আজিও তাহার জ্যোতিঃ চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। সর্ব ধর্মসমন্বয়ের কথাটা আজ অনেকেই গালভরা ভাষায় উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিজেদের আচরণ দ্বারা কেহ ইহার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন না। আকবরের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি সেই মধ্যযুগে যখন ধর্মান্ধতা মানবের বিবেক-বুদ্ধিকে অসাড় করিয়া দিয়াছিল সে-যুগেই দৃঢ় ভিত্তির উপর সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার উদার ও মহান হৃদয়ের স্বচ্ছ কেন্দ্রস্থল হইতে সর্বধর্ম সমন্বয়ের যে আদর্শ

উৎসারিত হইয়াছিল, তাহাই" দীন-ই ইলাহি" নামে পরিচিত। বর্তমান প্রবন্ধে এই দীন-ই-ইলাহি" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

(১) পটভূমিকা

জন্মাবধি আকবর বিপদঝঞ্ঝা সংগ্রাম ও কোলাহলের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অমরকোটে হুমায়ুনের জীবনের দুর্দিনে যখন তাঁহার জন্ম হয় সেই দিন হইতে রাজ্য প্রাপ্তির মুহূর্তকাল পর্যন্ত তিনি দিনেকের তরে স্বস্তি পান নাই। নানা ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যে থাকিয়া বাল্যবয়সে তিনি বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে পাঠান-যুগের চিরঅবসান দেখিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশাতে তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া ভারতে নূতন শক্তির অভ্যুদয় হইতে দেখিয়াছেন। বহু যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া এবং তাহাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়া মানব চরিত্র পাঠ করিবার তাঁহার প্রচুর অবসর হইয়াছিল। এদেশের রাজনীতি সমাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে তিনি বহু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। এইসব দেখিয়া শুনিয়া তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে পাঠানদের অনুসৃত-নীতি অবলম্বন করিলে ভারতে কোন শাসনপদ্ধতিই লোকপ্রিয় ও স্থায়ী হইতে পারে না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা ভ্রাতৃভাব ও ঐক্যানুভূতি থাকা দরকার। তাই আকবর স্থির করিলেন যে সমগ্র শাসনপদ্ধতির মধ্যে উদারতা বিশ্বাস ও সমন্ধার্থবোধ অনুবিষ্ট করিবেন। কিন্তু এইসব উদার মনোভাব শাসন কার্যে সংশ্লিষ্ট দুচারজন রাজকর্মচারীর মধ্যে জাগাইয়া দিলে কোন কাজ হইবে না। সমগ্র জনসাধারণের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও স্বার্থবিষয়ে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ হইতে দেশবাসীর মনোমধ্যে এমন একটা প্রতিযোগিতা ও বৈরভাব জাগ্রত হয় যাহা সুশাসনের পক্ষে মহা বিঘ্নকর। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় যদি পরস্পর মেলামেশা করিবার অবসর না পায়, একে অপরের ধর্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, অনুদার ও উদাসীন থাকিয়া যায়, যদি পরস্পরের স্বার্থ বিষয়ে তাহারা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তাহা হইলে দেশে স্বজাতিবোধ জাগ্রত হইতে পারে না। আকবর সম্রাট হইয়াই সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির মূলোৎপাটিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি নির্ভিক কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে অতঃপর শাসন ব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা

হইবে না। রাষ্ট্রে সর্ব সম্প্রদায়ের সমান অধিকার থাকিবে। পাঠানগণ জিজিয়া নামক যে ভেদমূলক কর হিন্দুদের নিকট আদায় করিতেন, আকবর তাহা রহিত করিলেন। ধর্ম ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রে উদারনীতি প্রবর্তিত করিলেন। মোগল সরকারে চাকরী, পেন্সন, জায়গীর, পদোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু মুসলমানের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এবং সকলকে জানাইয়া দিলেন যে দেশের সম্রাটের ধর্ম ইসলাম হইলেও দেশের রাষ্ট্র ইসলামিক রাষ্ট্র নয়। ইহা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে স্বজাতীয় রাষ্ট্র, ইহাতে সকলের সমান অধিকার আছে। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ প্রথায় উৎসাহ দিয়া হিন্দু মুসলমানের মিলনগ্রন্থিকে সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন। পাঠানগণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াও পরস্পরের মন হইতে ধর্ম সম্বন্ধে অনুদার ভাব দূর করিতে পারেন নাই। আকবর দেখিলেন ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর না হইলে সত্যিকার মিলন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাই তিনি প্রচার করিলেন সকল ধর্ম মূলতঃ এক, ও একই উৎস হইতে আসিয়াছে। আত্মার মুক্তি সকল ধর্মেই সম্ভব। ইতিপূর্বে এই অমোঘ বাণী অনেক সাধক ও সুফী প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ অশোকের পর এমন উদাত্ত কণ্ঠে কেহই সিংহাসনের উচ্চ বেদী হইতে এই মহাবাণী প্রচার করে নাই। শুধু প্রচার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি বিভিন্ন ধর্মের ভাবের আদান প্রদানের জন্য মধ্যে মধ্যে ধর্ম সভার আহ্বান করিতেন। তাহাতে দেশের নানা ধর্মনেতাগণ উপস্থিত থাকিয়া নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দে ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতেন।

(২) প্রস্তুতি

আকবরের প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মসভায় সকল সম্প্রদায়ের লোক যোগদান করিতেন। প্রথমে ইহার কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। পরে ইহার জন্য একটি প্রকান্ড অট্টালিকা প্রস্তুত হইল। তাহার নাম "এবাদাৎখানা" বা উপাসনাগার। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এই এবাদাৎখানায় সকল ধর্মের লোক একত্র মিলিত হইয়া প্রার্থনা, উপাসনা ও নিভৃত সাধনা করিবেন। আলোচনা, বিচার ও তর্ক করিবার উদ্দেশ্যে এই আগার রচিত হয় নাই। আকবর কখনও কখনও সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই ভবনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেন। এবং সুফী সাধকদের মন্ত্র "ইয়াহু, ইয়াহু ইয়াহাদী" (অর্থাৎ হে তিনি, হে পথপ্রদর্শক) আবৃত্তি করিতেন। এইভাবে সাধনা করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না।

কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল যে সকলে এইরূপ তন্ময়তা লইয়া এখানে আসে না। তাহারা আলোচনা ও তর্ক করিতে ভালবাসে। তাই আকবর বাধ্য হইয়া এখানে তর্ক ও আলোচনা করিবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু এখানে ধর্ম বিষয়ে যে সব আলোচনা হইতে লাগিল, তাহাতে আকবর ভয়ানক বিরক্ত হইলেন। অনেকক্ষেত্রে আলোচনার সময় তিনি উপস্থিত থাকিতেন। তিনি দেখিতেন ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও তর্ক করিতে গিয়া কেহ কোন বিষয়ে একমত হইত না। একজনে যাহাকে ঠিক ও অভ্রান্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিত, অন্যজন তাহাকে ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেন। কোন বিষয়কে একজন ঠিক বলিলে, অন্যজন তাহাকে ভ্রান্ত বলিবেনই। একজনের প্রামাণ্য বিষয়কে অপরজনে এরূপ যুক্তি তর্ক দিয়া খণ্ডন করিতেন যে মনে হইত ধর্মান্তর গ্রহণ ব্যতীত প্রথমজনের গত্যন্তর নাই। এই ধরনের তর্কবিতর্ক, প্রমাণ ও তাহার খন্ডন দেখিয়া আকবর অত্যন্ত মর্মাহত হইতেন। তাই তিনি প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর নিকট জানিতে চাহিলেন, সত্য মতটি কী? ভগবানের সান্নিধ্যলাভের পথ যদি একজনের জন্য মুক্ত হয়, তবে অপর সকলের জন্য কেন রুদ্ধ? যাহাতে সকল ধর্মের আচার্যগণ আলোচনা ও বিচার দ্বারা সত্য মতটি আবিষ্কার করিতে পারেন, সেই জন্য তিনি এবাদাৎখানাতে সর্বপ্রকার মত আলোচনা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি শিয়া সুন্নী, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, য়িহুদী, পারসিক এই কয়েকটি ধর্মের প্রতিনিধিকে এবাদাৎখানায় আলোচনা করিবার জন্য আহবান করিতেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া আকবর প্রতিষ্ঠিত "এবাদাৎখানা" Parliament of religions স্বরূপে কাজ করিয়াছে। যে যুগে ইউরোপে ধর্মমতের জন্য শত শত নিরীহ লোক যূপকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন করিতেছিল, সেই যুগে আকবর সর্বধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া বিরাট ধর্মসভার অনুষ্ঠান করিয়া উদারতা ও মানবতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এমন পরমতসহিষ্ণুতার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

(৩) দীনে এলাহি ও তাহার বৈশিষ্ট্য

নানা ধর্মমত আলোচনা করিয়া আকবর বুঝিলেন যে সার সত্য সকল ধর্মে আছে। উদারতার অভাবে মানুষ নিজের ধর্ম ব্যতীত অপর ধর্মকে শ্রদ্ধা করিতে পারে না। সেইজন্য তিনি স্থির করিলেন, সকল ধর্মের সার

সংগ্রহ করিয়া এমন একটি মতবাদ গঠন করিবেন যাহা সকলেই গ্রহণ করিতে পারে। অথচ তজ্জন্য কাহাকেও তাহার জন্মগত ধর্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে না। বাস্তবিক দীনে এলাহি কোন নূতন ধর্ম নহে। ইহা সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটা মিলন কেন্দ্র বিশেষ। আকবর নিজে সূফী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আর এই সূফী মতবাদকে ভিত্তি করিয়া তিনি দীনে এলাহি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার আদর্শ ও কর্মপন্থা স্থির করিয়া তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে এই মতবাদ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। ইহার পূর্বে এ বিষয়ে তিনি অনেক সাধনা ও আলোচনা করিয়াছিলেন। নানা ধর্মমতের মধ্যে আর একটা নূতন ধর্মমত স্থাপন করা তাঁহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। আর ইহা কোন নূতন ধর্ম ছিলও না। সেইজন্য ইহার কোন সংজ্ঞা বা definition ছিল না। যাহাকে বলে article of faith ইহার মধ্যে সেরূপ কিছু ছিল না। যে কোন ধর্মের লোক এই মতবাদ গ্রহণ করিতে পারিত। সব ধর্মের সারাংশ লইয়া ইহার কাঠামো গঠিত। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, পার্শি, শিখ প্রত্যেকেই ইহা গ্রহণ করিতে পারিত। দশটি আদর্শ ইহার মূলমন্ত্র ছিল ঃ—(১) উদারতা ও পরোপকার, (২) ক্ষমা ও ক্রোধ সংবরণ, (৩) পার্থিব বাসনার প্রতি অনাসক্ত; (৪) সর্ব প্রকার বন্ধন ও হিংসা হইতে মুক্তি লাভের চিন্তা এবং ভবিষ্যতের জন্য বিশুদ্ধ ও স্থায়ী মোক্ষ সঞ্চয়ন, (৫) চিন্তা ও সাধনার দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তি প্রাপ্তি (৬) জ্ঞান অর্জন, (৭) মৃদুস্বরে বাক্যালাপ, নম্রভাবে কথা বলা, ও অপরের হৃদয় রঞ্জন করা, (৮) সকলের সহিত এরূপ সদ্ব্যবহার করা যাহাতে নিজেদের ইচ্ছার উপর তাঁহাদের ইচ্ছা যেন প্রবল হয়, (৯) সর্বদা মহান ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, (১০) ঈশ্বরের প্রেমে আত্মাকে উৎসর্গ করা এবং ভগবানের সহিত মিলিত হওয়া। দীনে এলাহির আদর্শ অনুসরণ করিয়া মানুষ যাহাতে পবিত্র ও শুদ্ধ হইতে পারে তৎপ্রতি আকবরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। সৎভাবে জীবন যাপনের জন্য প্রতিটি কর্মে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে এক পবিত্র ভাব থাকা দরকার। ইহাই ছিল আকবরের আদর্শ। আকবর স্বীয় জীবনকে এই আদর্শ অনুসারে গড়িতে চাহিয়াছিলেন।

দীনে এলাহির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কোন পৌরোহিত্য প্রথা স্থান পায় নাই। আকবর নিজেই ছিলেন ইহার প্রচারক। তাঁহারই প্রভাব

পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণা হইতে ইহার উৎপত্তি। তিনি এই মতবাদকে দেশময় প্রচার করিবার জন্য কোন প্রচারক সংঘ সৃষ্টি করেন নাই। ইহা এককেন্দ্রিক ধর্ম ছিল। সেইজন্য আকবরের অন্তর্ধানের পর ইহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। আকবর নিজেও ইহাকে কোন দিন নূতন ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। ইহার জন্য কোন পৃথক পুরোহিতের ব্যবস্থা হয় নাই। পৃথক মন্দির রচিত হয় নাই। তবে এতৎসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করিবার জন্য কতকগুলি লোকের হস্তে কয়েকটি বিভাগের ভার দিয়াছিলেন। যথা—তাজুদ্দিন ইহার অনুষ্ঠানাদি বুঝাইবার ভার লইয়াছিলেন। আবুল ফজলের উপর ভার ছিল ইহার আভ্যন্তরীণ শৃংখলা বিধানের। যাঁহারা আন্তরিক পবিত্রতার জন্য উচ্চতর লোকে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কেবল তাঁহাদেরকেই শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করা হইত। কিন্তু কেহ ইহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার পূর্বে তাহাকে রীতিমতভাবে পরীক্ষা করা হইত। এই পরীক্ষার নিয়ম ছিল অত্যন্ত কঠোর। প্রত্যেক শিষ্যই যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন, তাহা নহে। অনেক অযোগ্য লোক শিষ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা শেষ পর্যন্ত টিকিতে পারেন নাই। আকবর যদিও ইহার সর্বপ্রধান স্তম্ভ ছিলেন, তবুও তিনি কখনও পোপের মত কোন মর্যাদা বা অধিকার দাবী করেন নাই। তিনি বলিতেন :—"আমি সর্বাগ্রে নিজেই সৎপথগামী না হইয়া কোন যুক্তিতে অপরের পথপ্রদর্শকের দাবী করিব? আমি দীনে এলাহির একজন দীনাতিদীন শিষ্য ব্যতীত আর কিছুই নহি।"

জনসাধারণের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করা ছিল আকবরের সম্রাট জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য। মহারাজ অশোকের মৃত্যুর আঠার শত বৎসর পর আকবরই বোধ হয় প্রথম সম্রাট যিনি প্রজাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য রাজ্যময় একটা সাধারণ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। উদারতা ও সর্বমতে সহিষ্ণুতা, এই দুইটি নীতি ছিল তাঁহার শিক্ষা। তিনি সর্বদা বলিতেন, "পরম নিষ্ঠার সহিত ভগবানের পূজা করিতে হইবে। পথের বিভিন্নতার জন্য পূজার কোন ব্যাঘাত হয় না।" প্রজাদের ধর্ম ব্যাপারে কোনও রূপ হস্তক্ষেপ করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতেন না। এই উদারতাই ছিল দীনে এলাহির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। তিনি বলিতেন, "যদি লোকে পছন্দ করে, তবে তাহারা ইচ্ছামত এই মত গ্রহণ করিতে পারে; ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে প্রেমের দ্বারা;—হিংসা ও হত্যার দ্বারা

নহে। প্রত্যেক মানুষের সৎ অসৎ নির্বাচন করিবার বোধশক্তি আছে। এরূপ ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করিলে মানুষের আত্মার কোন কল্যাণ হয় না। পার্থিব শক্তির ভয় থাকিলে ঐশী প্রেরণা লাভ করা যায় না।" কোন কোন মুসলমান আকবরের নিকট অনুযোগ করিয়া বলিত "আপনি মুসলমান হইয়া কেমন করিয়া বলেন যে সকল ধর্মে মুক্তি আছে?" তদুত্তরে আকবর বলিতেন, "সমগ্র মানবের বৃহত্তম অংশ অমুসলমান। আমি যদি তাহাদের উপর জোর করি তবে তাহার অর্থ এই যে, তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিই। কিন্তু তাহাতে কাহারও লাভ নাই।"

(৪) দীনে এলাহির দীক্ষা পদ্ধতি

পূর্বেই বলিয়াছি যে দীনে এলাহি কোন নূতন ধর্ম ছিল না। কিন্তু ইহা যখন একটা মতবাদ ছিল তখন কতকগুলি নিয়ম কানুন থাকা স্বাভাবিক। এই মতে দীক্ষা গ্রহণের নিয়মগুলি একটু অদ্ভুত ছিল। তাহার কারণ আকবর কতিপয় লোকের মধ্যে ইহাকে আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন। যাহারা সম্পত্তি, জীবন, মান সম্মান ও স্ব স্ব মতবাদ বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে সম্মত হইয়াছিল, কেবল তাহাদিগকে এই দীনে এলাহিতে দীক্ষা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইত। কাহাকেও ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে বলা হইত না। প্রত্যেক শিষ্যের জীবনকে কয়েকটি স্তরে বিভাগ করা হইত—যথা প্রথম স্তর, দ্বিতীয় স্তর, তৃতীয় স্তর, চতুর্থ স্তর। সম্পত্তি, জীবন, সম্মান ও মতবাদ এই চারিটি বিষয়ের মধ্যে কেহ কেহ একটি ত্যাগ করিতে অনুমতি পাইত। কেহ দুইটি, কেহ তিনটি এবং কাহাকে চারিটিই ত্যাগ করিতে হইত। যে কোন একটি ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্মত হইলেই সে শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইত। এবং প্রথম স্তরে প্রবেশ করিত। এইভাবে ত্যাগ স্বীকারের শক্তির উপর তাহার উচ্চতর স্তরে প্রবেশের অধিকার জন্মিত। কিন্তু দীক্ষা লইবার পূর্বে প্রত্যেক প্রার্থীকে অন্যভাবে যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হইত। প্রতি রবিবারে নূতন দীক্ষা প্রদান করা হইত। দীক্ষা গ্রহণের পর শিষ্য নতমস্তকে আকবরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইত। সম্রাট সান্নিধ্যে প্রত্যেক শিষ্যকে পাগড়ি ত্যাগ করিতে হইত। কেননা পাগড়ি অহংকার ও স্বার্থপরতার চিহ্ন। অতঃপর আকবর শিষ্যকে ভূমি হইতে উঠাইয়া লইতেন। এবং তৎক্ষণাৎ সে শিষ্য বলিয়া গণ্য হইত। আকবর তখন স্বহস্তে তাহার শিরে পাগড়ি পরাইয়া

দিতেন। প্রত্যেক দলে বার (১২) জন করিয়া লোক দীক্ষা লইতে আসিত। এই সব শিষ্য বা চেলারা নিজেদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃসংঘ গঠন করিত। তাহাদের একটা সাধারণ সাংকেতিক নিদর্শন ছিল। ফারসীতে তাহার নাম "শাস্ত"—অর্থাৎ যে কোন গোলাকার বস্তু। সচরাচর গোল অঙ্গুরীয় ব্যবহৃত হইত। ইহা পাগড়ির উপর বসান থাকিত। দীনে এলাহির শিষ্যগণের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ এই শাস্ত প্রত্যেকে ব্যবহার করিত। (এ যুগের গান্ধিটুপি, অথবা স্বস্তিকার মত); এই শাস্তের উপর "হে" অর্থাৎ "তিনি" এই শব্দটি চিহ্নিত থাকিত। শিষ্যগণ যথারীতি প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু প্রার্থনার কোন বিশেষ সময় নির্দিষ্ট ছিল না। আকবর নিজে তিন বার প্রার্থনা করিতেন। ইসলামের বিধি অনুসারে পাঁচবার প্রার্থনা করিতেন না। পশু হত্যা করা শিষ্যদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। মৃত্যুর পর দাহ করা অথবা কবর দেওয়া ইচ্ছানুরূপ এই দুই প্রথাই প্রচলিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের কতিপয় বিখ্যাত লোক এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান আবুল ফজল ও হিন্দু বীরবল ইহার প্রধান শিষ্য ছিলেন।

(৫) দীনে এলাহির প্রভাব

ইংরাজিতে যাহাকে বলে "in advance of time" আকবর প্রবর্তিত দীনে এলাহি ছিল তাহাই। সে যুগ ছিল অনুদারতা ও সংকীর্ণতার যুগ। উদার আচরণ ও সর্বধর্মের প্রতি সমব্যবহার, এই প্রকার মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার মত মনোবৃত্তি সকলের ছিল না। দীনে এলাহির পশ্চাতে রাজশক্তির যে প্রচ্ছন্ন প্রভাব ক্রিয়া করিতেছিল, আকবরের অন্তর্ধানের পর আর সে প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিল না। সুতরাং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দীনে এলাহির সমাধি রচিত হইয়া গেল। সেই ধর্মান্ধতাপূর্ণ মধ্য যুগে আকবর যখন ঘোষণা করিলেন Religion ought to be established by choice and not by violance তখন সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। কেননা এরূপ উদার বাণী সে যুগে কোন রাজশক্তির কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয় নাই। আকবরের সমসাময়িক ইউরোপের কথা চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে আকবর কত উদার ও মহান ছিলেন। সে যুগে ইউরোপের প্রত্যেক প্রদেশের রাজশক্তি বলপূর্বক স্ব স্ব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। "Religion of

the king is the Religion of the people" এই নীতি অনুসারে যখন ইউরোপে ধর্মের নামে সর্বত্র প্রজাপীড়ন হইতেছিল, সেই যুগে আকবর ধর্ম ব্যাপারে উদার নীতি অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক প্রজার চিন্তার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। আকবরের জীবনকাল পর্যন্ত এই উদার নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। ইহার ফলে অদ্ভুতভাবে দেশের মধ্যে সংস্কৃতি সমন্বয় হইতেছিল। হিন্দু মুসলমান পার্শী খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিবাদ বিসম্বাদ বিদূরিত হইতেছিল। আকবরের উত্তরাধিকারিগণ যদি আকবরের পন্থা অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান যদিও আকবরের মহান নীতি অনুসরণ করেন নাই, তবুও তাঁহারা আকবরের বিধি ব্যবস্থা একেবারে উলটাইয়া দেন নাই। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেব ধর্মান্ধতার যূপকাষ্ঠে এতদিনের সমস্ত সাধনাকে বলিদান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি ইতিহাসের মোড় ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। ফলে দেশের চতুর্দিকে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে আগুনে মোগলের রাজলক্ষ্মী জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। মোগল শক্তি আর মাথা তুলিতে পারিল না। আজ আকবর নাই, মোগল গরিমা নাই, কিন্তু সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। যুবরাজ দারা শিকোহ, মহাত্মা রামমোহন রায়, যুগ প্রবর্তক রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রমুখ সাধক ও সংস্কারকগণ সর্বধর্মসমন্বয়ের যে ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা আকবরের আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া আমরা বলিতে পারি দীনে এলাহির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই। দীনে এলাহি মরে নাই। ইহা নূতন পরিবেশে ও নূতন পরিস্থিতির মধ্যে নবতর রূপ ধরিয়া মানবের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সমন্বয় সাধন করিতেছে। এবং যুগ যুগ ধরিয়া করিবে।

মরমী লেখক দারা শিকোহ্

ইহা হয়ত অনেকে অবগত নহেন যে, সম্রাট শাহজাহান-পুত্র যুবরাজ দারা শিকোহ্ একজন অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। আধ্যাত্মিক কৃচ্ছ্রসাধন ও যোগ সাধনায় তিনি অনেক সুফি ও মরমী সাধককে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাছাড়া বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের তিনি যে সব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণিত হয় সে যুগে তাঁহার মত সুধী খুব কম লোকই ছিলেন। উদার মত ও একটি প্রসারিত হৃদয়ের জন্য তিনি সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই উদার মতের জন্য তিনি তৎকালীন গোঁড়া ও ধর্মান্ধদের নিকট অশেষভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে জীবন বলিদান করিতে হইয়াছিল। তাঁহার গভীর বিদ্যাবত্তা ও স্বাধীন অনুশীলন প্রবৃত্তির পরিচয় নানাভাবে পাওয়া যায়। তিনি যে সব গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকল যুগের সুধীবর্গের আদরণীয়। বলাই বাহুল্য যে, ধর্ম বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। যে যুগে মুসলমানগণ সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম বা অপরাপর ধর্মকে উদার ভাবে আলোচনা করিতে চাহিত না সেই যুগে দারা শিকোহ্ এমন সরল সহজ ও উদারভাবে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন যে, দেখিলে মনে হয় যেন বিংশ শতাব্দীর কোন যুক্তিবাদী লেখক বিভিন্ন ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রের অধিকাংশ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সুতরাং তিনি মণীষী আল বেরুনীর মত কয়েক বৎসর সাধনা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তারপর হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ আলোচনা করিয়া কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। অনেকেই এ সব গ্রন্থের সংবাদ রাখেন না। কিন্তু যে যুগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা প্রতিনিয়ত হইতেছে, সে যুগের লোকের জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই ভারতের বুকে একজন মহাপুরুষ নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় জীবনের মূল্য দিয়া সেই ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে দারা শিকোহের কয়েকটি

উৎকৃষ্ট গ্রন্থের পরিচয় দিব, যেন তদ্দৃষ্টে পাঠকবর্গের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি জাগিয়া উঠে।

(১) মাজমাউল বাহরায়েন — (দুই সমুদ্রের মিলন স্থান)—দারাশিকোহ রচিত একখানি বিখ্যাত পুস্তক। হিন্দু মুসলমানের মিলনকে তিনি "দুই সমুদ্রের মিলন" এই প্রকার রূপকভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতের প্রাক স্বাধীনতা পর্বে বহু প্রথম শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী নেতাও তাঁহার মত উদার-ভাবে বিষয়টিকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই পুস্তকে তিনি হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, বাহ্যতঃ পৃথক বলিয়া প্রতিভাত হইলেও উভয় ধর্মের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। সুফি ও হিন্দু দর্শনের বহু মিসটিক্ (মরমী) শব্দের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন যে, উভয় মতবাদের দৃষ্টি একই গন্তব্যস্থানের উপর নিবদ্ধ। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মীয় আদর্শ সম্বন্ধে একটা সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সেই অভিমত এই যে, এক ধর্মের সহিত অপরের সম্বন্ধটা analytic বা বিশ্লেষাত্মক নহে, বরং তাহা সাংযোজিক (Synthetic)। তাই বলিয়া তিনি আকবরের মত বিভিন্ন ধর্মের সংমিশ্রণে কোন নূতন ধর্ম স্থাপন করিতে চাহেন নাই,—তিনি দেখাইয়াছেন যে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে সত্যের আদর্শ একই, মুক্তি উভয় ধর্মেই সম্ভব। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি এইরূপ লিখিতেছেন—"আমি তাঁহারই নামে আরম্ভ করিতেছি যাঁহার কোন নাম নাই—যিনি দয়ালু ও করুণাময়; তাঁহাকে যে কোনও নামে আহ্বান কর না কেন, তিনি সকলের প্রার্থনা শ্রবণ করেন।" তাঁহার মতে ইসলাম ও হিন্দুধর্ম দুই যমজ ভ্রাতার মত। এই দুইটি ধর্ম যথাযত ব্যবস্থিত একটি বিন্দুসদৃশ—ইহারা একই সঙ্গে বিধাতার সেই অপরিম্লান রূপকে সগৌরবে প্রকাশ করে। ইহাদিগকে সেই একমাত্র পরাৎপরের নিকট পৌঁছিবার প্রবেশদ্বারে অবস্থিত দুইটি সুবিন্যস্ত স্তম্ভের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এই গ্রন্থখানি মৌলবী মহফুজুল হক সাহেব সম্পা-দনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন।*

(২) রিসালায়ে হাক নামা :—দারা শিকোহ এই গ্রন্থে যোগসাধনা সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত সত্য ও জ্ঞান লাভ

---

* দীর্ঘকাল পর গ্রন্থখানি সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।
—সম্পাদক

করিতে হইলে গভীর ধ্যান করা দরকার—কি প্রণালীতে সেই ধ্যান করিলে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে সেই সব বিষয় তিনি এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকটি লখনৌ হইতে নবল কিশোর প্রেস প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) নাদিরুন্নুকাতঃ—বাবা লালদাস নামক একজন কবীর পন্থী সাধকের সহিত দারার সাক্ষাৎকারের বিষয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই উভয় সাধকের মধ্যে যে সব কথোপকথন হয় তাহা দারা অতি নিখুঁত-ভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার লাহোরে অবস্থিতি কালে লালদাসের সহিত এই চমৎকার আলোচনাগুলি হইয়াছিল। এইসব সাক্ষাৎকার ও আলোচনার ধরনধারণ অত্যন্ত গভীর ও অতীব সরলতা—ব্যঞ্জকএ—কজন অপরকে যুক্তিতর্কদ্বারা পরাজিত করিব, এরূপভাবে কিছু হয় নাই,—দুইটি বন্ধনমুক্ত সাধক হৃদয়ে হৃদয়ে কথা কহিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল বিশ্বের উৎপত্তির কারণ, আধ্যাত্ম দর্শনের পথ এবং হিন্দুধর্মের মরমী সাধনা সম্বন্ধে। এই গ্রন্থের মূল ও তাহার ফরাসী অনুবাদ ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসের Journal Asiatique-এ প্রকাশিত হয়।

(৪) ভগবৎ গীতা ঃ—গীতার ফারসী অনুবাদ। অনেকে ভ্রম-বশতঃ বলিয়া থাকেন যে, ইহা আবুল ফজল অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ইহা দারার নির্দেশক্রমে ফারসীতে অনূদিত হয়। ইহাতে তাঁহার নিজের হাতও অনেক ছিল। (India Office Press)

(৫) যোগবাশিষ্ট ঃ—ইহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একখানি বিখ্যাত পুস্তক। আকবরের সময় ইহা সর্বপ্রথমে ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়। কিন্তু সেই অনুবাদে নানা ভ্রম-প্রমাদ ছিল বলিয়া দারা নিজেই ইহার ফারসী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন —এই গ্রন্থের বর্তমানে যে অনুবাদ আছে, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পিপাসা মিটাইতে পারে না, সেই জন্য আমার ইচ্ছা যে, সর্বসম্প্রদায়ের সুধীবর্গের পরামর্শানুক্রমে ইহার একটা ভ্রমশূন্য নূতন অনুবাদ প্রকাশ করি। শেখ ফয়জীর অনূদিত বলিয়া প্রকাশ, এরূপ একখানি অনুবাদ পাঠ করিলাম, এবং তাহাতে কিছু উপকারও পাইলাম বটে, কিন্তু দুইজন সাধু প্রকৃতির লোক আমার নিকট স্বপ্নে আবির্ভূত হইলেন—তাঁহাদের মধ্যে একজন পক্ককেশ ও দীর্ঘাকৃতি এবং অপরজন ক্ষুদ্রাকৃতি এবং সাহসী। প্রথমোক্ত ব্যক্তি স্বয়ং বশিষ্ঠদেব এবং শেষোক্ত জন রামচন্দ্র। আমি যখন সেই অনুবাদ পড়িতে-ছিলাম, তখন বশিষ্ঠদেব আমার পৃষ্ঠে মৃদুভাবে থাবড়াইতে লাগিলেন,

এবং রামচন্দ্রকে বলিলেন যে, আমি তাঁহার ভ্রাতা। কারণ উভয়েই সত্যের অনুসন্ধিৎসু। তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, আমাকে আলিঙ্গন করিতে। রামচন্দ্র অত্যধিক ভালবাসার সহিতই আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে কতকগুলি মিষ্টি দিলেন, এবং আমাকে দিতে বলিলেন —আমি তাহা লইলাম এবং খাইয়া ফেলিলাম। এই স্বপ্নের পর সেই গ্রন্থখানি নূতনভাবে অনুবাদ করিবার প্রবৃত্তি আমার বলবতী হইল। (Journal of the Punjab Society).

(৬) সিররে আসরার (উপনিষদ) :—ইহা উপনিষদের ফারসী অনুবাদ। দারা শিকোহ ফারসী ভাষায় উপনিষদের যে অনুবাদ করিয়াছেন, বহুযুগ পর্যন্ত তাহাই ছিল ইউরোপীয় সুধীবর্গের ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে জানিবার একমাত্র পুস্তক বা অবলম্বন। কিভাবে দারার উপনিষদ ইউরোপে নীত হইল, তাহা পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলারের Sacred Book of the East series-এর Upanishad-এর ভূমিকায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতের সভ্যতা, কৃষ্টি ও সাহিত্যের প্রধান ভিত্তি হইতেছে বৈদিক সাহিত্য। যুগ যুগ হইতে তাহার প্রভাব ভারতের সাহিত্যে; দর্শনে ও কৃষ্টি কলায় পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। সেই আদি যুগ হইতে এই বৈদিক সাহিত্যের ধারা পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হইতে হইতে আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত এই সাহিত্য ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া ইউরোপে প্রবেশাধিকার পায় নাই। পরে ইউরোপে উপনিষদের মধ্যবর্তিতায় ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার সম্যক পরিচয় পাইল। ইউরোপ উপনিষদের সর্বপ্রথম যে পরিচয় পাইল তাহা মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে নহে—তাহা দারা শিকোহের ফারসী অনুবাদের লাটিন অনুবাদ হইতে। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উপনিষদের কোন সংবাদ ইউরোপ রাখিত না। সেই বৎসর আকেতিল দ্যুপের (Auquetil Duperron) নামক একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক উপনিষদের ফারসী অনুবাদের পাণ্ডুলিপি (দারার অনুবাদ) প্রাপ্ত হইলেন। ইহা তাঁহাকে সুজাউদ্দৌলার দরবারের জনৈক ফরাসী দূত প্রেরণ করেন। সেই গ্রন্থখানি পরে বার্নিয়ার সাহেব ফরাসী দেশে লইয়া যান। দ্যুপের পরে আর একখানি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন এবং দুইটিকে মিলাইয়া দেখেন এবং তৎপরে সেই ফারসী অনুবাদকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু ইহা

প্রকাশিত হয় নাই। পরে আর একখানা লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ ১৮০১ ও ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়।

এই অনুবাদখানি পণ্ডিত শ্রেণীর লোকের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহা দুরূহ ও দুর্বোধ্য লাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। বিখ্যাত দার্শনিক শোপেন-হায়ার ইহার সার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি ইউরোপের নিকট ঘোষণা করিলেন যে, ইহার মধ্যে অগাধ রত্নরাজি নিহিত আছে। শোপেন-হায়ার লিখিতেছেন—রাজকুমার দারা ভারতেই জন্মগ্রহণ করেন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি একজন সুশিক্ষিত, চিন্তাশীল ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার উপনিষদের অনুবাদ উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছিল। দ্যুপের সেই ফরাসী অনুবাদকে লাটিন ভাষায় শাব্দিকভাবে অনুবাদ করেন এবং দারা যে সব সংস্কৃত শব্দের অনুবাদ করেন নাই, ইনি সেগুলিরও অনুবাদ করেন।

দারা শিকোহ তাঁহার উপনিষদের ভূমিকা 'ওম শ্রীগণেশায় নমঃ' এই বলিয়াই আরম্ভ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে টিকা মূলে তিনি হিন্দু দর্শন ও সুফী মতবাদের মধ্যে একটা সুবিহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ইহাতে বলিতেছেন—"বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাধু সুফী ও যাজক শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিবার সুযোগ আমার যথেষ্ট হইয়াছিল এবং খোদার একত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের মত জানিবার অবসর পাইয়াছি। আমি বাইবেল নূতন ও পুরাতন নিয়ম পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই সব গ্রন্থে একত্ববাদের যে আদর্শ আছে তাহা আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। পরে শুনিলাম যে, হিন্দু একত্ববাদিগণ উপনিষদে একত্ববাদ সম্বন্ধে পরিষ্কার আদর্শ দিয়াছেন। এই উপনিষদ চারি বেদের সারাৎসার। সেই সময় আমি অহরহঃ সত্যানুসন্ধান করিতেছিলাম। তাই আমি সমুদয় উপনিষদ সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলাম এবং দেখিলাম যে, ইহা একত্ববাদের খনি। তাই এই গ্রন্থের ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিতে মনস্থ করিলাম।"

ইহা মনস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড় বড় পণ্ডিতকে একত্রিত করিলেন, এবং তাহাদের সাহায্যে তিনি নিজেই ইহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুবাদে তিনি মূলের একটা অংশও বাদ দেন নাই, অথবা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অন্যত্র বলিতেছেন "এতাবৎ যে সব সত্য অনুসন্ধান

করিতেছিলাম, উপনিষদের মূল গ্রন্থে আমি তাহার সন্ধান পাইলাম। মানুষকে খোদাতালা যে সব প্রেরিত পুস্তক দিয়াছেন, উপনিষদ তাহাদের মধ্যে আদিম গ্রন্থ।" এই উপনিষদ একত্ববাদ আদর্শের প্রধান উৎস। তাঁহার দৃষ্টিতে কোর-আনের একত্ববাদের আদর্শের সহিত উপনিষদের আদর্শের কোনই বিরোধ নাই বরং তিনি এই উভয় গ্রন্থের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেন। তিনি আরও দাবী করিতেছেন যে, উপনিষদ পাঠ করিয়া আমি এমন সব বিষয় জানিলাম ও বুঝিলাম যাহা পূর্বে জানিতাম না ও বুঝিতাম না।

অন্যত্র আর একটি প্রবন্ধে বলিয়াছি যে দারা হিন্দু শাস্ত্রের ভক্ত হইলেও ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ইসলামের ভক্ত ছিলেন এবং ইহাকে পূর্ণ ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তবে তাঁহার সহিত অন্যান্য মুসলমানের পার্থক্য এইখানে যে, ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য সব ধর্ম মিথ্যা, দারা তাহা মনে করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন, সব ধর্মই সত্য। কারণ যাহার মধ্যে সত্য আছে তাহা বিভিন্ন যুগের প্রভাবে কুসংস্কারপূর্ণ হইলেও তাহা মূলত সত্য। এই সব কুসংস্কার দূর করিয়া দিলেই খাঁটি সত্য রূপ বাহির হইয়া পড়িবে। হিন্দু ধর্মকেও তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। উপনিষদ পাঠ করিয়া তাঁহার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। তিনি এই দুই ধর্মের কোনও বিষয়টিকে কাটছাট করিয়া একটা নূতন ধর্ম স্থাপন করিতে চাহেন নাই। তবে কোর-আন ও উপনিষদ পাঠ করিয়া তিনি মনে করিলেন যে, উভয় গ্রন্থের মধ্যে অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে। তাই তাঁহার আশ্চর্য বোধ হইল যে, কোর-আনে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের পরিচয় আছে, অথচ হিন্দু ধর্মের কোন গ্রন্থের কোন উল্লেখ নাই। তখন তিনি অনুসন্ধিৎসু হইয়া কোরান পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ একটা শ্লোকের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাহাতেই তিনি উপনিষদের সন্ধান পাইলেন। শ্লোকটি এই রূপ :—"ইন্নাল কোরআনুল্ করীম ফিকিতাবিম মকতুম, লা ইয়ামসাহু ইল্লাল মুতাহ-হেরুমা নাজিলুল মিন রাব বিল আলামিন"।—ইহা সেই মহা কোর-আন তাহা একটা পুস্তকের মধ্যে লুক্কায়িত আছে, যাহা পবিত্রতা ব্যতীত কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। ইহা পৃথিবীর অধিপতির নিকট হইতে প্রত্যাদেশ"। দারা শিকোহ বলিতেছেন "কোর-আনের এই শ্লোকে যে পুস্তকের সংকেত দিয়াছে তাহা বাইবেলকে বুঝায় না। এই লুক্কায়িত পুস্তকখানি উপনিষদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ উপনিষদ অর্থে "গুপ্তজ্ঞানের পুস্তক"। ইসলামী পরিভাষায় "ফাউজুল আমিন" নামক

একটি কথা আছে। দারার মতে ইহার অর্থ হিন্দু দর্শন অনুসারে চরম মুক্তি। দারার এই মতবাদ বিশেষতঃ কোর-আনের এই প্রকার আলোচনা হয়ত কোনও মুসলমান সহজে গ্রহণ করিবেন না। তা না করুন কিন্তু তিনি যে কত উদার ছিলেন এই সব আলোচনা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। ধর্মবিধানের কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার পবিত্র আত্মা সত্য পাইবার জন্য কিরূপ আকুলি বিকুলি করিত তাহা এইসব আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইবে। অতীতে ও বর্তমানে এরূপ লোক খুব কম আছেন যিনি দারার মতন সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন, অথচ দারার সংবাদ কেহই রাখেন না। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কোনই আয়োজন হয় না।* দারার মত মহাপুরুষের আদর্শ এদেশের হিন্দু মুসলমান সকলেরই জন্য প্রয়োজন—দারার মত লোকের উদ্ভব হইলে দেশের অনেক কল্যাণ হইবে।

*এ বিষয়ে সম্প্রতি কিছু কিছু আলোচনা শ্রুত হয়।

শহীদ সরমদ

বাবর হইতে আওরঙ্গজেব—এই ছয়জন মোগল বংশের মুকুটমণি। বাবর করেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। আকবর করেন এই সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ও প্রসারিত। জাহাঙ্গীর ও শাহ জাহানের যুগে মোগল গরিমার চরম বিকাশ ও উন্নতি হইয়াছিল। আর আওরঙ্গজেব দূরদৃষ্টির অভাবে এই বিশাল সাম্রাজ্যকে নানা দিক দিয়া দুর্বল করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারই সময় মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ববর্তী সম্রাটগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়া যে সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিলেন তাঁহার ধর্মান্ধতার দ্বারা। এই জন্য তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। আকবরের উদারতা দেশের মধ্যে একটা মহৎ মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেব শরীয়তের নামে সেই উদার আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিলেন। পূর্ববর্তী মোগল সম্রাটদের উদারতার প্রভাবে দেশের চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তন হইতেছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেব শরীয়তী শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষকে সপ্তম শতাব্দীতে প্রত্যাবর্তন করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি ঘড়ির কাঁটাকে পিছাইয়া দিয়া মনে করিলেন যে এই ভাবে অতীত যুগ ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তিনি বুঝিলেন না যে, "আদি যুগ পুরাতন, ফিরিবে না আর।" তাঁহার বিবেচনাহীন শাসন নীতির ফলে মোগল সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। পূর্ববর্তী মোগল সম্রাটদের প্রভাবে দেশে যে উদার ঐতিহ্য সৃষ্টি হইয়াছিল, আওরঙ্গজেব যদি তাহাতে বাধা সৃষ্টি না করিতেন, তবে হয়ত ভারতের পক্ষে শুভকর হইত। একজন ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবকে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। আওরঙ্গজেব দ্বিতীয় ফিলিপের মতই ধর্মের ব্যাপারে সংকীর্ণমনা ছিলেন। ধর্মান্ধতার জন্যই ফিলিপের রাজনৈতিক জীবন ব্যর্থ হইয়াছিল। আওরঙ্গজেবও সেই একই কারণে বহু দিক দিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ফিলিপের পরে স্পেন

আর কোনদিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। ঠিক তেমনি আওরঙ্গজেবের অদূরদর্শিতার ফলে মোগলের গৌরব-সূর্য চিরঅস্তমিত হইয়া গেল। তিনি ধর্মান্ধতার যূপকাষ্ঠে নিজের ভ্রাতৃগণকে বধ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শুধু ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাঁহার ধর্মান্ধতার জন্য সেই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাধককে শরীয়তের নামে নিহত করিয়াছিলেন। এই সাধকের নাম সুফী সরমদ। সরমদ সে যুগের একজন আত্মভোলা ফকীর। সর্বসম্প্রদায়ের লোকের তিনি শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু শরীয়ত পন্থী আলেমগণ, আর তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক আওরঙ্গজেব এই নিতান্ত নিরীহ স্বভাবের সুফীকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে শরীয়তের নামে নিহত করিয়া মনে করিলেন ধর্মের পথ নিরঙ্কুশ হইয়া গেল। কিন্তু ঐভাবে কোনদিন ধর্মের পথ নিরঙ্কুশ হয় নাই। এই প্রবন্ধে সরমদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সরমদের আদি বাসস্থান পারস্য-দেশে। শৈশব কাল হইতে তিনি প্রতিভার পরিচয় দিতে থাকেন। উত্তরকালে তিনি কবিখ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধর্ম সম্বন্ধে একটা উদার ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। অনেক সময় তিনি এমন সব বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন, শরীয়ত শাস্ত্রে যার সমর্থন পাওয়া যাইত না। সেই জন্য রক্ষণশীল মৌলবী সম্প্রদায় তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। আর তাহাদেরই চক্রান্তে ঘাতকের হস্তে তাঁহাকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল।

পারস্যের অন্তর্গত 'কাশানে' ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে সরমদ একটি য়িহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা আরমেনিয়ান য়িহুদী ছিলেন। য়িহুদীদের প্রথা অনুসারে সরমদ য়িহুদী ধর্মগ্রন্থ দিয়া পাঠ আরম্ভ করেন। তাঁহার ছিল প্রচণ্ড প্রতিভা। অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত য়িহুদী ধর্মশাস্ত্র সমাপ্ত করিলেন। জ্ঞানলাভের জন্য তিনি খৃষ্টান ধর্মের নিউ টেস্টামেন্ট বা নববিধান পাঠ করিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। আরও অধিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। যেকোন ধর্মগ্রন্থের সারশিক্ষা তিনি সহজেই গ্রহণ করিতে পারিতেন। সুতরাং ইসলাম ধর্মে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। আরবী ও ফারসী ভাষায় তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করিলেন। মৌলানা মোল্লা সদর উদ্দিন সিরাজ এবং

মোল্লা কাসিম ফিনদারসকি সেযুগের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। সরমদ এই দুইজন পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করিলেন। সরমদের এই দুইজন শিক্ষক মোটেই গোঁড়া ও ধর্মান্ধ ছিলেন না। বিশেষ করিয়া মোল্লা ফিনদারসাক ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি বেদ ও উপনিষদের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া সরমদ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার অভ্যাস লাভ করিলেন। তিনি কিছুদিনের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি স্বাধীন চিন্তার অভ্যাস ত্যাগ করেননি। সে যুগের সাধারণ মুসলমান অপেক্ষা তাঁহার ধর্মবোধ ও ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করিলেও তিনি সর্ব ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। অতঃপর তিনি ভারতবর্ষে চলিয়া আসিলেন।

ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে সরমদের জীবনের অনুপুংখ বিবরণ জানিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু জানা যায় যে তিনি কিছুদিন পারস্যের সুফী সম্প্রদায়ের সান্নিধ্য লাভ করার পর ব্যবসা উপলক্ষে ভারতবর্ষে আসিলেন। সে যুগে ভারতবর্ষ ও ইরাণের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। উভয় দেশের বণিকগণ স্বাধীনভাবে মালপত্র লইয়া আসা-যাওয়া করিতেন। সরমাদ ভারতবর্ষের খ্যাতি পূর্ব হইতে শুনিয়া থাকিবেন। সেইজন্য পণ্য বিক্রয় উদ্দেশ্যে তিনি সমুদ্র পথে ভারতবর্ষের পথে যাত্রা করিলেন।

অনুমান ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে সরমদ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। সিন্ধু প্রদেশের টাট্টা নামক একটি বন্দরে তাঁহার জাহাজ নোঙর করিল। এই বন্দরে কিছুদিন তিনি ছিলেন, এবং এইখানে অভয়চাঁদ নামক একটি বালককে তাঁহার খুব ভাল লাগিল। এই বালকটি তাঁহার অন্তরের দোসর হইয়া পড়িল। তাহাকে দেখিতে না পাইলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। সে যুগে সুন্দর বালককে ভালবাসার একটা রেওয়াজ হইয়া গিয়াছিল। পাছে কোন দুর্নাম রটনা হয়, এই ভয়ে অভয়চাঁদের পিতা তাঁর ছেলেকে একটি অজ্ঞাত স্থানে লুকাইয়া রাখেন। এই বালককে দেখিতে না পাইয়া সরমদ অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একেবারে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সে যুগের মোগল চিত্রে সরমদের এই বস্ত্রহীন অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। একটি বালকের প্রতি সরমদের এই ভালবাসার মধ্যে কোন কামপ্রবৃত্তি বা পাপের লালসার লেশমাত্র ছিল না। বোধ হয় সেইজন্য সরমদের ভালবাসা বালকের উপরও একটা অলৌকিক

প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বালকটি পরে পিতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সরমদের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার পর হইতে বহুদিন তাহারা একত্র থাকিতেন। কিছুদিন পর তাঁহারা উভয়ে লাহোরে আসিলেন। মুতামাদ খাঁ সে যুগের একজন নামকরা লেখক। তিনি বলিতেছেন "আমি একটি উদ্যানে সরমদকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম যে তিনি একেবারে উলঙ্গ। তাঁহার দেহের সর্বত্র ঘন কোঁকড়ান চুলে আবৃত। আর তাঁহার আঙ্গুলে লম্বা লম্বা নখ। তিনি অনবরত কথা বলিয়া যাইতেছেন। আর মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার পারস্য ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন। মনে হইল যে তিনি একজন কবি।"

সমসাময়িক বিবরণ হইতে আমরা সরমদ সম্বন্ধে তিনটি বিষয় জানিতে পারি :—(১) তাঁহার ভারতবর্ষের আগমনের তারিখ, (২) একটি বালকের প্রতি তাঁহার Platonic love বা কামগন্ধহীন ভালবাসা। এই ভালবাসার ফলে তিনি সংসার বিরাগী উদাসীন হইয়া পড়িলেন। (৩) তাঁহার লাহোর আগমনের তারিখ। কারণ এই সময় সম্রাট শাহজাহান কাশ্মীর হইতে লাহোরে আসেন। এই সময় সরমদ যে একেবারে সংসার বিরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা জানা যায় আর একটি ঘটনা হইতে। তাঁহার যাহা কিছু সম্পদ ছিল সমস্তই তিনি দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। সরমদ উলঙ্গ অবস্থায় জনবহুল পথে পাগলের মত ঘুরিতে লাগিলেন। এই জন্য লাহোরের সংস্কৃতিবান সমাজে ভয়ানক আন্দোলন হইতে লাগিল। কিন্তু সরমদ কাহারও কোন কথা শুনিলেন না। সেই যে বস্ত্র ত্যাগ করিলেন সারা জীবনে আর তাহা গ্রহণ করিলেন না। জনসাধারণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত বলিয়া লাহোরের কর্তৃপক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না।

এইখানে একটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আজিকার যুগের মানুষের মার্জিত রুচি বালকের প্রতি সরমদের ভালবাসা সমর্থন করিতে পারিবে না। কিন্তু মধ্য যুগের সাধক ও সুফীদের জীবনেতিহাস হইতে জানা যায় যে তাঁহারা কোন কাম-প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কাহাকেও ভালবাসেন নাই। তাঁহারা এক প্রকারের কবি ছিলেন। যে কোন বস্তুতে সৌন্দর্য দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইতেন। প্রত্যেক সৌন্দর্যকে তাঁহারা মনে করিতেন ঈশ্বরের আনন্দ ও সৌন্দর্যের একটা ঝলক মাত্র। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করিতেন যে অন্যান্য বিষয়ের মত যৌবনের সৌন্দর্য হইতেছে ঈশ্বরের মহিমার প্রতীক। আর সৌন্দর্যের আরাধনা তাঁহাদের নিকট

ঈশ্বর আরাধনার মতই নিঃস্বার্থ ও নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তির সৌন্দর্যকে আরাধনা করিতে করিতে প্রকৃত সুফীর জীবনে এমন একটা স্তর আসে যখন তাঁহার নিকট ঈশ্বর ও তাঁর ভালবাসার আস্পদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। সব এক হইয়া যায়। মহর্ষি মনসুর এই স্তরে উপনীত হইয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, "আনাল হক"—আমিই ঈশ্বর। চন্ডিদাস বলিতে পারিয়াছিলেন "রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়।" সরমদ একটি শ্লোকে এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ঃ—

"এই বিশ্বের বিরাট মঠে, জানি না আমি
কে মোর প্রভু, অভয়চাঁদ না অন্য কেহ।"

বালকের প্রতি এই ভালবাসার যে কোন ব্যাখ্যাই করা হোক না কেন, সে যুগের কেহই ইহার মধ্যে কোন নৈতিক স্খলন দেখে নাই। প্রিয় শিষ্যের প্রতি যোগীর, অথবা পুত্রের প্রতি পিতার যে ভালবাসা, অভয় চাঁদের প্রতি সরমদের ভালবাসা বাহ্যিক দিক দিয়া সেই রূপই ছিল। অভয় চাঁদ সরমদের সঙ্গে সারাজীবন কাটাইয়াছেন। ঘাতকের হস্তে সরমদের জীবনাবসান হইলে অভয়চাঁদও মনের দুঃখে দেহত্যাগ করেন। সরমদের সংস্পর্শে আসিয়া অভয়চাঁদেরও বহু উন্নতি হইয়াছিল। সরমদ তাঁহার প্রিয় ভক্তকে প্রচলিত বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে অভয়চাঁদ কবিতা রচনা করিতে শিখেন। অভয়চাঁদের কবিতাগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য। তবে তাঁহার রচিত কবিতার একটি শ্লোক আজিও প্রচলিত আছে। ইহা তাঁহার কবি প্রতিভা ও উদার হৃদয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ঃ—

"হাম মতিয়া ফুরকানাম; হাম কাশিশি রাহবানাম
রাব্বিয়ি এহুদানাম, কাফিরাম, মুসলমানাম্।"

অর্থাৎ—আমি একই সময়ে কোরআনের অনুবর্তী, আমি পুরোহিত, সন্ন্যাসী, য়িহুদী যাজক, হিন্দু ও মুসলমান। অভয়চাঁদ ও সরমদের ধর্মবিশ্বাস যে কত উদার সার্বজনীন তাহা এই শ্লোকটি প্রমাণ করিতেছে। অতঃপর ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সরমদ হায়দরাবাদ যাইবার পথে দিল্লীতে উপনীত হইলেন। এই সময় যুবরাজ দারা শিকোহ ধর্মালোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মের মিসটিসিজম বা মরমীবাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ছিলেন। এবং সরমদের মত সাধু পুরুষের সন্ধান করিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঠিক এই সময় সরমদের সহিত দারার পরিচয় হয় নাই। হায়দরাবাদে কিছুদিন থাকার পর সরমদ যখন পুনরায় দিল্লী আসেন সেই সময় তাঁহার সঙ্গে দারার বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

হায়দরাবাদের তৎকালীন রাজা আবদুল্লাহ কুতুবশাহ সরমদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। এখানে সরমদ নানা শ্রেণীয় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। রাজা ও তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত আরও অনেকে তাঁহাকে দেখা করিতে আসিত। তাহারা তাঁহার বহু অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া মুগ্ধ হইত। তিনি যাহাদেরকে আশীর্বাদ করিতেন, তাহারা নানাভাবে উপকৃত হইত। তিনি মীর জুমলাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন যে তিনি অনেক বড় পদ পাইবেন। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই মীরজুমলা মোগল সেনাদলে যোগদান করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই বাংগলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। সরমদ হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রীকে সাবধান করিয়াছেন যে অবিলম্বে তাঁহার মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল। কারণ কিছুদিন পর মক্কা যাইবার পথে জাহাজডুবিতে প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। হায়দরাবাদে সরমদ মুখে মুখে বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কবি ও মরমী সাধকগণ তাঁহার এই সব কবিতা আগ্রহের সহিত শুনিতেন। তাঁহার এই সব কবিতা রাজ্যের সীমা পার হইয়া ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বিদ্বান সমাজ বুঝিলেন যে, একজন প্রকৃত কবি এদেশে আসিয়াছেন।

ইতিপূর্বে কবি হিসাবে এবং একজন তত্ত্বদর্শী সাধক হিসাবে সরমদের খ্যাতি দিল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দিল্লীবাসিগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিল। হায়দরাবাদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি যখন দিল্লীতে পদার্পণ করিলেন তখন বহু লোক তাঁহার দর্শন লাভের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের অনেকে, অবশ্য, তাঁহার অদ্ভুত চেহারা, হাবভাব ও জীবন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই উলঙ্গ সন্ন্যাসী খাঁটি সাধু না হইয়া পারে না। ব্যার্ণিয়ার সাহেব বলেন, তিনি দেখিলেন যে সরমদ আদিম মানব শিশুর মত উলঙ্গ অবস্থায় দিল্লীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি আওরংগজেবের প্রলোভন ও ভয় ভীতিকে সমানভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন। মানুসী (মানুচি) তার একজন ইউরোপীয়ান পরিব্রাজক। তিনি লিখিয়াছেন যে সরমদ সর্বদায় সর্বক্ষণ উলংগ অবস্থায় থাকিতেন। ব্যতিক্রম হইত কেবল দারা শিকোর বেলায়। কারণ, দারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি একটুকরা কাপড় দিয়া লজ্জাস্থান ঢাকিতেন।

মত্ত অবস্থায় মুখে মুখে কবিতা আবৃত্তি তার এই প্রকার উলংগ বেশ—

যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীরবে সাধুর চরণে প্রণতি জানাইয়াছে। দারা শিকোহ সর্বদাই তাঁহার নিকট আসিতেন। তিনি ক্রমেই সাধু সরমদের নৈকট্য লাভ করিতে লাগিলেন। দারা তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের এই সম্পর্ক পরে উভয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই ধর্ম সম্পর্কে উদার মত পোষণ করিতেন। শুধু তাহাই নহে, শরীয়তের বিধান অপেক্ষা আধ্যাত্মিক ও মরমী আদর্শকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। সরমদকে সম্রাট শাহজাহানের নিকট পরিচিত করাইবার জন্য দারা বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। শাহাজাহান সরমদের অলৌকিক শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য এনায়েত খাঁকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এনায়েত খাঁ সরমদের বাহ্যিক হাবভাব দেখিয়া বিরক্ত বোধ করিলেন। তিনি মনে করিলেন যে সরমদ একটা নিতান্ত বাজে লোক। সুতরাং তিনি শাহজাহানের নিকট এই রিপোর্ট পেশ করিলেন যে, "সরমদের কিছুই অলৌকিক নহে। তার গুপ্তস্থান সদা উন্মুক্ত—ইহা ব্যতীত তাহার আর কিছুই বৈশিষ্ট্য নাই।" কিন্তু শাহজাহান এই রিপোর্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি এনায়েত খাঁকে বলিলেন যে, "একটুকরা বস্ত্রই দুর্নামকারীর জিহ্বাকে সংযত করিতে পারে।" শাহজাহানের সহিত সরমদের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল কিনা তাহা বলা যায় না। কিন্তু যেহেতু দারা সরমদকে শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন, সেই জন্য শাহজাহান সরমদের নিন্দা সহ্য করিতে পারিতেন না। রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ সরমদের নিন্দা করিয়া বেড়াইলেও দারার সহিত সরমদের নৈকট্যের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রহিল। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হইত, আলাপ আলোচনা ও পত্রালাপ হইত। তখনও দারা যুবরাজ মাত্র। তবুও তাঁহার উপর কতকগুলি রাজকার্যের ভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অপেক্ষা ধর্মালোচনায় অধিক সময় ক্ষেপণ করিতেন। তাঁহার দরবারের দ্বার সাধু সুফীগণের জন্য অবারিত ছিল। রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের প্রতি এই প্রকার অবহেলার জন্য তাঁহাকে পরে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শীঘ্রই এইসব আলোচনার চির অবসান হইল। কারণ, অল্প দিনের মধ্যেই আওরঙ্গজেব সমস্ত রাজক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইলেন। তিনি শাহজাহানকে বন্দী করিলেন। ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলুষিত করিলেন। আর যেখানে পারিলেন শরীয়ৎ-বিরোধী মরমী সাধকগণকে গ্রেপ্তার করিয়া জাল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দারার সঙ্গী ও গুরুজন ছিলেন সরমদ। সুতরাং

তিনিও ধর্মান্ধতার কবল হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। কিভাবে নিরীহ সূফী সরমদের জীবনাবসান হইল, এইবার সেই কথা বলিব।

আওরঙ্গজেব রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া শরীয়তী ব্যবস্থার উপর জোর দিলেন। দারা ও তাঁহার সঙ্গীগণ যে উদার ধর্মমত প্রচার করিতেন তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। এইবার তিনি তাহাদের দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বহু পূর্বে সরমদ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে শাহজাহানের পর দারাই রাজা হইবেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব ইতি-মধ্যে দারাকে হত্যা করিয়া ফেলেন। সুতরাং সরমদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইল। আওরঙ্গজেব রাজপদে উপবেশন করিয়া সরমদকে দরবারে আনয়ন করিলেন। তিনি সরমদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তোমার প্রিয় রাজ-কুমার কোথায় আছেন? তদুত্তরে সরমদ বলিলেন, "তিনি এইখানেই উপস্থিত আছেন। তবে আপনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়স্বজনদের উপর অত্যাচার করিয়াছেন। এবং নিজে রাজা হইবার জন্য ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলুষিত করিয়াছেন। দারা যে অনন্ত সাম্রাজ্যের রাজা হইয়াছেন, আপনি কোনদিন সেখানে যাইতে পারিবেন না।" সরমদের এই উত্তরে আওরঙ্গজেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি শরীয়ৎ-বিরোধী সূফীদেরকে ধ্বংস করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অত্যাচারে সূফীদের সংঘ ভাঙ্গিয়া গেল। মরমী সূফীদেরকে নাম-মাত্র বিচারে হত্যা করা হইল। কিন্তু তিনি বহুদিন পর্যন্ত সরমদের অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। উচ্চ নিম্ন সর্বশ্রেণীর লোকের উপর সরমদ একটা শক্তি-শালী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই জন্য সরমদকে অপসারিত করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না। আওরঙ্গজেব দরবারের ওলামাদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। দারার হত্যার ব্যাপারে এই সব ওলামাগণই তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন॥ গোঁড়া মোল্লা সম্প্রদায় বলিলেন যে সরমদকে নিম্ন কারণে কাফের ঘোষণা করিয়া বধ করা হোক:– (১) সরমদ উলঙ্গ অবস্থায় অবাধে সর্বত্র ভ্রমণ করেন। তাঁহার এই আচরণ শরীয়ৎ সমর্থন করে না। (২) সরমদ ইসলামের রীতি নীতি মানিয়া চলে না ও ইসলামের কলমা সম্পূর্ণটা উচ্চারণ করেন না। তিনি কেবল মাত্র "লা এলাহা"টুকু উচ্চারণ করেন। ইহার অর্থ "আল্লাহ নাই।" (৩) সরমদ হজরত মহম্মদের সশরীরে মেরাজ বা স্বর্গ গমন বিশ্বাস করেন না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ সরমদের এই উক্তিটি উপস্থিত করা হইল: "যে স্বর্গের রহস্য বুঝিতে পারে সে স্বর্গ অপেক্ষাও বিরাট ও মহান হইয়া পড়ে। মোল্লারা

বলেন যে আহমদ (অর্থাৎ হজরত মহম্মদ) সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন। আর সরমদ বলে যে স্বর্গই আহমদের নিকট আসিয়াছিল।"

"ধর্মদ্রোহিতা" সরমদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইলেও আসলে সেই কারণে তাঁহাকে হত্যা করা হয় নাই। আওরঙ্গজেব দারার সঙ্গী ও বন্ধুকে সহজে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। সে যুগে সরমদের মত আরও অনেক ব্যক্তি উলঙ্গ হইয়া থাকিতেন। শরীয়ৎ-বিরোধী উক্তি আরও অনেকে করিতেন। কৈ, তাঁহাদের তো বিচার হয় নাই? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সরমদকে হত্যা করিবার প্রধান কারণ রাজনৈতিক। দারার সমর্থক কাহাকেও জীবিত রাখিব না, ইহাই ছিল আওরঙ্গজেবের সংকল্প।

সরমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিবার ব্যাপারে যিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং আওরঙ্গজেবের ওস্তাদ ও প্রিয় সভাসদ ইমদাদ খাঁ মোল্লা কাভী। এই মোল্লা কাভী সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন; দিল্লীর অপরাপর ওলামাগণকে কোনওরূপ শ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি ইহা চাহেন নাই যে, দিল্লীতে তাঁহা অপেক্ষাও প্রভাবশালী ব্যক্তি কেহ জনসাধারণের সম্মান শ্রদ্ধা পাইবে। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, এক উলঙ্গ ফকীরের নামে দিল্লীর লোক পাগল। তাহারা সমস্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা সরমদকেই অর্পণ করিতেছে। দিল্লীতে সরমদের উপস্থিতি মোল্লা কাভীর মর্যাদাকে একেবারেই লঘু করিয়া দিল। তাই তিনি আইনের আশ্রয় লইয়া সরমদকে অপসারিত করিবার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

সরমদ ধৃত হইলেন এবং যে-আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন উক্ত মোল্লা কাভী, সেই আদালতে তাঁহার বিচারের ব্যবস্থা হইল। সরমদ জানিতেন যে এই বিচার একটা প্রহসন মাত্র। তিনি বীরের মত সমস্ত অভিযোগের উত্তর দান করিলেন। এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন যে, তিনি নির্দোষ। কেন তিনি সাধারণ লোকের মত জীবন যাপন করেন না, তাহার উত্তর প্রদান করিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিলেন যে তাঁহার বস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই। সেইজন্য, সত্যই তিনি উলঙ্গ হইয়া থাকেন। শাস্ত্র হইতে নজির দেখাইলেন যে, পয়গম্বর ইসায়া বৃদ্ধ বয়সে উলঙ্গ হইয়া বিচরণ করিতেন। একটি ফারসী শ্লোক দ্বারা তিনি তাঁহার মনোভাবটি বুঝাইয়া দিলেন: "ঈশ্বর পাপীকে তার পাপ আবরণ করিবার জন্য বস্ত্র দেন, কিন্তু যে, আজন্ম নিষ্পাপ তাহাকে তিনি দেন উলঙ্গতার আবরণ।" আর একটি অভিযোগ এই যে, তিনি শাস্ত্রসম্মত সম্পূর্ণ কলমা উচ্চারণ করেন না। ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন যে, সত্যই তিনি কলমার সমস্তটা

উচ্চারণ করেন না। কারণ, তিনি এখনও সম্পূর্ণ সত্যটা পান নাই। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এখনও তিনি অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছেন। যেদিন তিনি ঈশ্বরকে স্বচক্ষে দেখিবেন সেই দিন তিনি সম্পূর্ণ কলমা উচ্চারণ করিবেন। কোন কিছুর বাস্তব স্পর্শ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেওয়া মিথ্যা শপথ মাত্র। তাহা তিনি করিতে পারিবেন না। তৃতীয় অভিযোগের উত্তরে তিনি কী বলিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে, সম্ভবতঃ সুফীদের বিশ্বাসমত তিনি এই ধরনের কোন কথা বলিয়া থাকিবেন। ঈশ্বর প্রত্যেক স্থানে ও বস্তুতে বিদ্যমান। যাহারা এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছে তাহারা স্বর্গ-মর্তের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। কারণ, তাহাদের নিকট সবই এক। সুফীদের মতে, হজরত মহম্মদের মেরাজ সশরীরেই হউক, অথবা স্বপ্নের মাধ্যমেই হউক, একই কথা। যিনি স্থান ও কালের সীমার মধ্যে নাই, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হজরত মহম্মদকে কোথাও যাইতে হইবে না। সুফী শাস্ত্রে ইহারই নাম "ওয়াহদাতুল ওজুদ।"

পূর্বেই বলিয়াছি এই বিচার একটা ধাপ্পা মাত্র। আসল উদ্দেশ্য ছিল সরমদের সমর্থকদের চোখে বিচারের নামে ধূলি দিয়া তাঁহাকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করা। সরমদের যুক্তি যতই বিচার সম্মত হউক না কেন, তাবেদার বিচারকগণ তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং তিনি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধর্মের নামে হত্যা করা ইতিহাসে নূতন নহে। ধর্মান্ধতা ও মরমী ভাবের মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে একটা বিরোধিতা। পূর্বে মহর্ষি মনসুর হাল্লাজ এইভাবেই নিহত হইয়াছিলেন। সেই একই অপরাধে সরমদও নিহত হইলেন। কিন্তু সেজন্য সুফীদের গোষ্ঠীতে তিনি অমর হইয়া রহিলেন।

বিচারের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সমাপ্ত হইবার পর সরমদকে ফাঁসীর স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। দারাকে গণ-আন্দোলনের ভয়ে রাত্রির অন্ধকারে হত্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু সরমদের হত্যার ব্যবস্থা হইল প্রকাশ্য দিবালোকে। ঘাতক প্রচলিত প্রথা অনুসারে সরমদের মুখে ঢাকিবার জন্য বস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু সরমদ বলিলেন, মুখ ঢাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। অতঃপর তিনি একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। তাহার ভাবার্থঃ "হে বন্ধু! তুমি উলঙ্গ তরবারি লইয়া আসিয়াছ। তুমি যে-বেশেই আস না কেন, আমি তোমাকে চিনি।" তারপর আর একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন : 'দূরে শুনিলাম একটা চীৎকার ধ্বনি ; আর আমরা

অনন্ত নিদ্রা হইতে চোখ খুলিলাম এবং দেখিলাম যে ইহা পাপের রজনী। আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম।" ঘাতক যখন তাঁহার উপর মারাত্মক অস্ত্র তুলিতে উদ্যত ঠিক সেই সময় তিনি আবৃত্তি করিলেন : ভালবাসার পথে উলঙ্গ দেহ হইতেছে ধুলা (বাধা)। সেই দেহটাও তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। কথিত আছে যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে শাহ আব্দুল্লাহ নামক সরমদের একজন পরিচিত ব্যক্তি নিকটে আসিয়া বলিল : "এখনও বাঁচিবার সময় আছে। তোমার দেহের উপর একখন্ড বস্ত্র রাখ, সমস্ত কলমা উচ্চারণ কর—তাহা হইলে আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিতেছি যে তুমি মুক্তি পাইবে।" সরমদ ধীরভাবে তাহার দিকে তাকাইলেন, অন্য কোন কথা বলিলেন না, কেবল একটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন : "অনেক দিন হইল লোকে মনসুরের নাম ভুলিয়া গিয়াছে। আমি আবার ফাঁসীর মঞ্চ ও ফাঁসীর দড়ির প্রদর্শনী দেখাইতে আসিয়াছি।"

কথিত আছে যে ঘাতক যখন তাঁহার মস্তকটি দেহ হইতে দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য অসি উদ্যাত করিয়াছে ঠিক সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে সম্পূর্ণ কলমা উচ্চারিত হইল। যেন তিনি ঠিক মৃত্যুর মুহূর্তে সমস্ত সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন। প্রচলিত প্রথা অনুসারে যেস্থানে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল, ঠিক সেই স্থানেই তাঁহাকে সমাহিত করা হইল। আজিও তাঁহার সমাধিস্থানে একটি গুম্বজ বিদ্যমান আছে। আজ তাঁহার সমাধি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার সমাধির উপর যে তৃণগুচ্ছ জন্মিয়াছে, তাহা বৎসরের সকল সময় সবুজ হইয়া থাকে। লোকে বলে, দ্বিতীয় মনসুরের ইহাও একটা মিরাক্‌ল্‌।

ঘাতকের হস্তে সরমদ শহীদ হইলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁহার প্রভাব ক্ষুণ্ন করিতে পারিলেন না। সরমদ একজন শ্রেষ্ঠ সুফীর মর্যাদা লাভ করিলেন। সরমদ ছিলেন স্বভাব-কবি। তিনি মুখে মুখে বহু রুবাইয়াত রচনা করিয়াছিলেন। সে-সব কবিতা লোকের মুখে মুখে দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। শরীয়ৎ–বিরোধী–সংসার বিরাগী সুফীদের কবিতার মত সরমদের কবিতা আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। সরমদ বিশ্বাস করিতেন যে, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তিনি মন্দিরে আছেন, মসজিদে আছেন, মক্কার কাবা-গৃহের কৃষ্ণ প্রস্তরে আছেন, আবার হিন্দুদের প্রতিমার মধ্যেও আছেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অবস্থিতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি একটি কবিতায় বলিয়াছেন : "তুমি ফুলের মধ্যে আছ। তুমি পর্বতে, মরুতে, উদ্যানে আছ। আবার কখনও তুমি আলোরূপে দেখা

দাও, কখনও ফুলের সৌরভে আত্মপ্রকাশ কর। তুমি যেমন উদ্যানের নীরব কুঞ্জে বিরাজমান, সেইরূপ তুমি জনবহুল সভামাঝেও দীপ্যমান।" তাই সরমদ বলেন ঃ "আমি সত্যের সার সর্বত্র একই রূপ দেখি।" ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য একটা অন্তরদৃষ্টি থাকা চাই। এই অন্তর দৃষ্টি ঈশ্বরের দান। সরমদ বলেন যে, সদ্‌গুরুর সাহায্যে মানুষ তার অন্তর দৃষ্টির সদ্ব্যবহার করিতে শেখে। তখন তাহার হৃদয় স্বর্গীয় আলোকে বিভাসিত হয়। সরমদ পাপীদেরকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, "ঈশ্বর সর্বদাই ক্ষমাশীল। ঈশ্বরের ক্ষমা সম্বন্ধে হতাশ হইও না।" পৃথিবীর সকল মানুষের পাপের সমস্ত বোঝা অপেক্ষা ঈশ্বরের ক্ষমা শক্তি অনেক বেশী। ঈশ্বরের ক্ষমা মানুষের সমস্ত পাপকে লঘু করিতে পারে। অন্যান্য সুফীদের মত সরমদ শরীয়তের উপর নির্ভর করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, সুফীদের পন্থাই সত্য পন্থা। এই পন্থাই মানুষকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে লইয়া যাইবে। তাই তিনি শরীয়তের পন্থা মানিয়া চলিতেন না। তিনি বলিতেন যে, শরীয়ৎ একটা লোক দেখানো প্রদর্শনী মাত্র। তাঁহার মতে শরীয়ৎ পন্থীরা প্রেমের পথ জানে না। আর প্রেমের পথই ঈশ্বরের পথ। বহু বিষয়ে সরমদের কবিতা কবি ওমর খাইয়ামের কবিতার অনুরূপ। কিন্তু সরমদের কোন পাশ্চাত্ত্য ভাষ্যকার নাই। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য দেশ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। আনন্দের কথা যে সম্প্রতি বিশ্বভারতী সরমদের রুবাইয়াত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর ইসলামিক ও উর্দু বিভাগের অধ্যাপক মৌলানা ফজল মহম্মদ আসিরি সাহেব এই গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছেন। উদার ধর্মমত ও সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় আলোচিত হওয়া খুবই দরকার। সেই দিক দিয়া সরমদের জীবন-দর্শন আলোচনার একটা সার্থকতা আছে। শহীদ সরমদ জিন্দাবাদ।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে গান্ধিজীর দান

সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক স্যার টমাস ব্রাউন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Religio Medici'-র একস্থানে লিখেছেন—

I am of a Constitution so general that it consorts and sympathises with all things ; I have no antipathy or rather idiosyncrasy in anything. Those natural repugnances do not touch me, nor do I behold with prejudice to French, Italian, Spaniard or Dutch.

সুসাহিত্যিক স্যার টমাস ব্রাউনের (সপ্তদশ শতাব্দী) এই উক্তিটি মানববন্ধু গান্ধীজির প্রতি অতি সুন্দরভাবে প্রযোজ্য। তিনি ছিলেন বিশ্ব মানব। তাঁর নিকট মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ ছিল না। তিনি সার্বজনীন বিশ্ব-নাগরিক, পরিপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। নানা ধর্মসম্প্রদায় অধ্যুষিত এই ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্সী, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ইহুদী ও কত ধর্মসম্প্রদায় বসবাস করে। এই বিশাল দেশের সকল মানুষকে আপনার লোক মনে করতে পারে এমন ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত কম। এরূপ উদারতাও বহুলোকের নাই। আর সেই জন্যই এদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা এত বিরাট আকার ধারণ করেছে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে মানুষে মানুষে ব্যবধান ও ঝগড়া—বিবাদ থাকা সম্ভব কিন্তু একই দেশে বসবাস করে ধর্মগত পার্থক্যের জন্য কেন মানুষ মানুষের সহিত বিরোধ ও বিবাদ বিসম্বাদ করতে থাকবে ? মানবীয় মনের দুর্বলতার জন্য যদি সে বিরোধ কখনও কখনও ঘটেও থাকে তবে কেন তা ঘন ঘন ঘটতে থাকবে ? কেন দেশের এক বিরাট অংশ সাম্প্রদায়িকতারূপ ভ্রান্ত আদর্শ দ্বারা বিভ্রান্ত হতে থাকবে ? যে কয়েক জন মুষ্টিমেয় লোক ভারতের সকল সম্প্রদায়কে আপনার বলে মনে করতেন ও কোনও ভেদজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতেন না মহাত্মা গান্ধী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। স্যার টমাস ব্রাউনের মত, তিনি বারবার বলেছেন যে তিনি সকল সম্প্রদায়ের বন্ধু হতে চান, সকলের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে সর্বদাই প্রস্তুত। এবং শেষ পর্যন্ত

মাইনরিটি সম্প্রদায়ের জন্যই ঘাতকের হাতেই আত্মবলিদান করলেন। গান্ধীজি কেবল ভারতের কথাই ভাবেন নি। বিশ্বের সকল মানুষের সেবার জন্য তিনি আপনাকে উৎসর্গিত করে ছিলেন। তিনি সকলকেই আত্মজ্ঞান করতেন ও সকলকে ভালবাসতেন। কোনও রূপ ভেদজ্ঞান তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে নি।

যে কোন কারণেই হোক ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সমস্যা মাঝে মাঝে দেশের শান্তি শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করে তুলেছিল। এর গোড়াতে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতি সক্রিয় হয়ে কাজ করত তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত আছে জেনেও এবং স্বীকার করেও এ দেশের বহু লোক সাম্প্রদায়িক ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শুধু প্রভাবিত নয় কতকটা বিভ্রান্তও হয়েছিলেন। তার ফলে বৃটিশ প্রভুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পেরেছিল।

সাম্প্রদায়িকতা একটা বিকৃত মনোভাব থেকে জন্মলাভ করে। সেই বিকৃত মনকে পরিশুদ্ধ করতে না পারলে এ সমস্যা আরও কিছুকাল অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে। জাতির জনক গান্ধীজি তাঁর নানাবিধ আচরণ, কথাবার্তা, প্রবন্ধ ও ভাষণের মধ্য দিয়ে এমন সব মূল্যবান কথা বলেছেন যা অনুসরণ করে চললে মানুষের অন্তর থেকে বিকৃত মনোভাব দূর হয়ে যাবে। এবং সাম্প্রদায়িকতার স্থানে বিশুদ্ধ মনে প্রেমের ভাব জাগ্রত হবে এ বিশ্বাস আমি রাখি।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে—যেখানে নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে—সে দেশে সাম্প্রদায়িক ঐক্য একান্ত দরকার। এ দেশে সর্বপ্রযত্নে এমন ব্যবস্থা করা দরকার যাতে বিভিন্ন সম্প্রদায় পরম সৌহার্দ্য সহযোগিতার সহিত বাস করতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে গুণটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে 'tolerance' বা সহনশীলতা। এক সম্প্রদায়ের পক্ষে অপর সম্প্রদায়ের ধর্ম রীতিনীতি ক্রিয়াকান্ড শ্রদ্ধার চোখে দেখা যদি সম্ভব নাও হয় তবুও তাদের বিশ্বাস, ধর্মমত ইত্যাদির প্রতি সহনশীল হওয়া একান্ত দরকার। সহনশীলতা এমন একটা গুণ যা বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোকেদের মধ্যেও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম।

মহাত্মা গান্ধী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের এই মৌলিক নীতিটি সম্যকভাবে অবগত ছিলেন। তাঁর জীবনী আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে তিনি সহনশীলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি

সমস্ত ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতেন। কোন ধর্মাবলম্বীর প্রাণে এতটুকু ব্যথা লাগলে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে এক সম্প্রদায়ের অন্যায় আচরণের জন্য যদি অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়েছে তবে তিনি তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে কঠোর অনশনব্রত গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর ভালবাসা সকল লোকেরই অনুকরণীয়।

বহুদিন পূর্বেকার কথা। তখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়-দের অধিকার আদায় করবার জন্য সংগ্রাম করছেন। সে সময় তিনি তার অসাম্প্রদায়িক আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তব রূপ দেবার সুযোগ পেয়ে-ছিলেন। একটি মুসলিম ধনিকের মামলা চালাবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর আগমন। সেখানে দেখলেন ভারতীয় হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি একসঙ্গে বাস করছে। তাদের সামনে অসাম্প্রদায়িক প্রীতি ও ভালবাসার আদর্শ তুলে ধরলেন। সে দিনের সেই আদর্শকে তিনি মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে রেখে ছিলেন। সেই আদর্শকে রূপ দিতে গিয়ে অবশেষে স্বাধীন ভারতে শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী জননী কস্তুরবা গান্ধী হিন্দু মুসল-মানকে একান্তভাবে উপলব্ধি করবার সুযোগ লাভ করলেন। সেখানে বৃটিশ সরকারের ভেদনীতি ততটা প্রবল ছিল না। সেইখানেই তিনি মুসলিম সমাজকে তাদের ধর্ম সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে পরম হৃদ্যতার সহিত বিচার করবার সুযোগ পেলেন। তাদের দুঃখ কষ্ট, অভাব অসুবিধার মধ্যে তাদের পাশে এসে তাদের সেবা করতে কুণ্ঠিত হলেন না। বস্তুতঃ গান্ধীজির মুসলিম প্রীতির সূত্রপাত হয় দক্ষিণ আফ্রিকাতে। তারপর, দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ শেষ করে যখন তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁর সে প্রীতি সহানুভূতি ও ভালবাসাকে বিস্তৃত পটভূমিকায় বাস্তব রূপ দেবার জন্য আজীবন সাধনা করলেন। তাঁর মুসলিম প্রীতি আরও গভীর ব্যাপক হল।

এটা অনস্বীকার্য যে সাম্প্রদায়িক প্রীতির জন্য উদার মনোভাব ও সহনশীলতার একান্ত প্রয়োজন। অপর ধর্মের বিশ্বাস, প্রথা রীতি, কালচার আচার অনুষ্ঠানের প্রতি গান্ধীজির ছিল চরম উদারতা। এসব ব্যাপারে তাঁর মত সহনশীল মানুষ খুব কম ছিল। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় তিনি যে অকাতরে তার সহিত এক হ'তে পেরেছিলেন তার মূল কারণ তাঁর উদারতা। তিনি ভেবে দেখলেন যে মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে

সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে চান খিলাফতের প্রশ্ন তাঁদেরকে ব্যথিত করেছে। সুতরাং তাঁদের ব্যথার ব্যথী হয়ে তিনি তাকে সমর্থন করতে দ্বিধা করলেন না। স্বরাজ সংগ্রামের সময় তিনি হিন্দু মুসলিম ঐক্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিলেন। আজ একথা সকলের জানা দরকার হিন্দু মুসলিম ঐক্য তাঁর নিকট অনেকটা দরকষাকষির ব্যাপার নয়। এই ঐক্য তাঁর কাছে ছিল জীবন মরণের সমস্যা। সাম্প্রদায়িক ঐক্য তাঁর কাছে ছিল আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। সেই যুগে তিনি 'ইয়ং ইন্ডিয়া'তে যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, এবং বিভিন্ন সভায় যে সব ভাষণ দিয়েছিলেন তা পাঠ করলে জানা যাবে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য কী আকুলতার আবেদন ছিল। সমগ্র অন্তর দিয়ে তিনি ঐক্যের বাণীকে রূপ দিবার চেষ্টা করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও প্রীতিকে তিনি ভারতের জাতীয় জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আজ মনে হচ্ছে যে সেদিন দেশের লোক যদি তাঁর আবেদনে আন্তরিক সাড়া দিত, ও তাঁর আদর্শকে সাগ্রহে গ্রহণ করত তা হলে কোন দিন দৃঢ় ভিত্তিতে এ দেশে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপিত হয়ে যেত। তারপর থেকে হয়ত দাঙ্গা হাঙ্গামাগুলি অতীতের বিষয় হয়ে যেত। সে দিন দেশের সর্বত্র যে ভাবে হিন্দু মুসলমান প্রীতির উচ্ছ্বাস বহে ছিল তাতে মনে হয়েছিল যে; এ ঐক্য বুঝি সুদৃঢ় হয়ে গেল। এ ঐক্য আর ভাঙ্গবে না। কিন্তু তা হ'ল না। নানা দিকের নানা চাপে এ ঐক্য ভেঙ্গে গেল। দেশের বুকে কত অপকাণ্ড হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দেশ বিভাগও হয়ে গেল। তবুও সম্পূর্ণ ঐক্য স্থাপিত হল না।

দূরদর্শী গান্ধী জানতেন যে বিদেশী শাসক ভারতের হিন্দু মুসলিম ঐক্য চায় না, তারা তা হতে দিবে না। নানা বাধা সৃষ্টি করে, কখনও হিন্দুকে কখনও মুসলমানকে নানা ভাবে উৎসাহিত করে ঐক্যের ভিত্তিতে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করবে। তাদেরই চেষ্টার ফলে দেশের বুকে পরস্পর বিরোধী দুটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সক্ষম হল। এরা যে দেশের প্রভূত ক্ষতি করবে এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তবুও তিনি হতাশ হন নি। পুনঃ পুনঃ ঐক্যের উপর জোর দিতে লাগলেন। যাতে দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সে দিকে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করলেন।

তিনি দেখলেন যে ভারতবর্ষে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে তাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। তাই তিনি

হিন্দুসমাজের নিকট আবেদন করেছিলেন তারা যেন এমন কোন কাজ না করে যাতে মুসলিম সমাজের মনে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনরূপ সন্দেহ জাগে। তিনি আরও আবেদন করলেন যে হিন্দুরা এমন আচরণ না করে যার ফলে মুসলমান-সমাজের প্রাণে ব্যথা লাগে। মুসলমান সমাজের নিকটও তিনি ঠিক অনুরূপ ভাবে আবেদন করলেন তারাও যেন এমন কাজ না করে যার ফলে হিন্দুরাও মুসলমানকে শত্রু মনে করে অথবা হিন্দুর প্রাণে ব্যথা লাগে। হিন্দু মুসলমান শত শত বছর ধরে এ দেশে পাশাপাশি হৃদ্যতার সঙ্গে বসবাস করে আসছে। সেই অতীতে তাদের মধ্যে ত সাম্প্রদায়িক ধরনের কোন সমস্যার উদ্ভব হয় নি। আজ স্বরাজ সংগ্রামের সময় কেন এসব সমস্যা রুদ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে? সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি কাউকে নিজ নিজ ধর্মের কোন অংশ ত্যাগ করতে বলেন নি। কিন্তু পরিতাপের কথা এই যে ধর্মের মূলকথা নিয়ে কোন গণ্ডগোল হয় না। ধর্মের অপব্যাখ্যা করে এ দেশের ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষকে খেপিয়ে তুলে। তাই যত গণ্ডগোল। গান্ধীজির মূল কথা এই যে যদি প্রকৃত ধর্মের উপর দাঁড়িয়ে থাক তাহলে কিছুতেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা দানা বাঁধবে না।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্মগত যতই পার্থক্য থাকুক না কেন এদেশে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা আছে তার মূল কারণ এই সব পার্থক্য নহে। তা যদি হত তবে বহুপূর্বেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। এই সব সাম্প্রদায়িক সমস্যার পশ্চাতে আছে রাজনৈতিক কারণ। এই রাজনৈতিক কারণ নানাভাবে উস্কানি দিয়ে সমস্যাকে ঘোরাল করে তুলেছে। রাজনীতি সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তিতে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করে অনুপ্রবেশ করেছে তাই ঐক্য প্রতিষ্ঠার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয়ে গেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশের মধ্যে জাতীয় চেতনার সূচনা হয়েছিল। এই জাতীয় চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য বৃটিশগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল দল সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় ও অবলম্বন করে দেশের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি করতে লাগল। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ দেখল যদি সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ভিত্তিতে স্বাধীনতা আন্দোলন চলতে থাকে তবে তা শেষে এমন জোরদার হবে যে তাদের সম্মিলিত দাবী অস্বীকার করা অসম্ভব হবে; কিন্তু, যদি ছলে-বলে কৌশলে হিন্দু মুসলিম ঐক্যকে ভেঙ্গে দিতে পারা যায় তবে অন্ততঃ কিছু-দিনের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে। তারা যা চেয়েছিল তাই হল। সৎ লোকের উদ্যম ব্যর্থ হল।

সে দিনের সে সব কথার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। যাক; তা বলবার সময়

নাই। তবে সাম্প্রদায়িক সমস্যা যখন জঘন্যতম হয়ে উঠল তখন গান্ধী কী অংশ গ্রহণ করেছিলেন সে সম্বন্ধে দু একটি কথা বলব। দেশের চারিদিকে যখন সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিস্তৃত হয়ে পড়ল, এবং বহুলোক সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা জর্জরিত হতে লাগল তখনও গান্ধীজি ঐক্যের আশা ছাড়েন নি, তিনি সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যের আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে থাকলেন। দেশ বিভাগের প্রশ্ন নিয়ে যখন নানা তর্ক-বিতর্ক সমগ্র ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করে তুলেছিল এবং কংগ্রেসেরই একদল সদস্য দেশবিভাগকে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন, তখনও গান্ধীজি তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। তিনি দুই জাতিত্বের থিওরীকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। বরং বারবার তাকে বাধাই দিয়েছিলেন। তিনি বল্লেন যে তা হ'লে তাঁর চিরপোষিত আদর্শকে পদদলিত করা হবে। এই সময় গান্ধীজির বহু বন্ধু ও সমর্থকগণ তাঁর বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হলেন না। বহু মুসলমান যেমন তাঁকে ভুল বুঝেছিল, তেমনি বহু হিন্দুও এখন থেকে তাঁকে ভুল বুঝতে আরম্ভ করল। কিন্তু এই সব ভুল বুঝাবুঝি দ্বিধা ও সংকোচের মধ্যেও গান্ধীজি দিনেকের তরেও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রতি তাঁর বিশ্বাস থেকে এতটুকু টলেন নি। দেশবিভাগের প্রাক্কালে যে সব দাঙ্গাহাঙ্গামা হতে লাগল তা অত্যন্ত ভয়াবহ ধরনের। প্রথমে দাঙ্গাহাঙ্গামা হ'ল নোয়া-খালিতে। গান্ধীজি স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দাঙ্গা বিধ্বস্ত মাইনরিটি সম্প্রদায়কে রক্ষা করার ব্যবস্থা করলেন। নোয়া-খালির দাঙ্গা শেষ হতে না হতেই বিহারে দাঙ্গা বেধে উঠলো। ঝড়ের বেগে গান্ধীজি সেখানে উপস্থিত হলেন। এবং উপদ্রুত মাইনরিটিদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করলেন। দেশবিভাগের ঠিক পরে কলিকাতার বুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে উঠলো। গান্ধীজি দাঙ্গা উপদ্রুত বেলেঘাটার একটি ঘরে নিজেই বাস করতে লাগলেন। এবং সেখানে বসেই দাঙ্গা থামাবার ব্যবস্থা করলেন। এই মহান মানুষের মনে এই সব দিনে একটুও শান্তি ছিল না। কিন্তু তবুও তিনি আশা ছাড়েন নি। গান্ধীজি তাঁর আচরণ দ্বারা প্রমাণ করলেন যে তিনিই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অকৃত্রিম বন্ধু।

দেশবিভাগের পরে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটে গেল তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। কিন্তু এত রেষারেষি ও রক্তারক্তি সত্ত্বেও গান্ধীজি কিছুতেই সাম্প্রদায়িক ঐক্যে বিশ্বাস হারান নি। তিনি সেই দিনের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছিলেন যেদিন ঐক্য, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে—যে দিন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

সেই সময় পূর্ব পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত থেকে বহু মুসলমান সীমান্ত পার হয়ে দেশে চলে গিয়েছিল। তিনি বল্লেন যে তাদের মধ্যে যারা এদেশে ফিরে আসতে চায় তাদের সে সুযোগ দেওয়া হোক। এবং এমন আবহাওয়া প্রস্তুত করতে হবে যাতে তারা এদেশে সকলের অভ্যর্থনা পায়। তাঁর সমস্ত নীতি ও পলিসির ভিত্তিতে ছিল প্রেম, প্রীতি ও অহিংসা। সেই সময় অনেকে তাঁর এই নীতি পছন্দ করলেন না। তাদেরই একদল লোক তাঁকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দিবার ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তাঁর এই আত্মদানের সময় মুসলমানগণ বুঝলো যে তিনি সত্যিই তাদের বন্ধু। দিল্লীর সেই নিদারুণ দিনের কথা স্মরণ করা যাক। যখন সর্বত্র আগুন জ্বলে, উঠেছে তখন গান্ধী 'একলা চলার আদর্শ'' অনুসারে সেই তপ্ত কড়ায়ের উপর দাঁড়িয়ে দুবাহু বাড়িয়ে মাইনরিটি সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে লাগলেন। এবং অবশেষে প্রাণ বলিদান করলেন। মহাদেবের মত নিজেই সমস্ত বিষ পান করে ফেল্লেন। গান্ধিজীর কথাও কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, জীবনের শেষ কাজটিতেও তিনি তাই প্রমাণ করে গেলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে সাম্প্রায়িক ঐক্যের যে মহান কাজ আরম্ভ করেছিলেন মৃত্যুর দিনে নিজের মহৎ আচরণ দ্বারা তাকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। আজ এই মহামানবের জন্ম শতবার্ষিকীর উৎসবের দিনে তাঁর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আসন সমবেত কণ্ঠে বলি জয়তু গান্ধীজি।

ইন্দো-ইরাণীয়ান সাহিত্যে জাতীয় অনুভূতি

ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতেই ভারতের সহিত আরব জগতের একটা সম্পর্ক ছিল। সে যুগের সমসাময়িক আরবী সাহিত্য থেকে এই সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যাবে। হজরত মহম্মদ (সাঃ) ভারতবর্ষ সম্পর্কে কতিপয় মূল্যবান উক্তি করেন। চতুর্থ খলিফা হজরত আলি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ একটা পবিত্র ও সুগন্ধিপূর্ণ দেশ। তাঁর মতে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হজরত আদম স্বর্গ থেকে এই ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হন। এ দেশের বৃক্ষরাজি স্বর্গের সুরভিপূর্ণ।

ফারসীভাষী লোকেরা ভারতকে তাদের আবাসভূমিতে পরিণত করার বহু পূর্বে আরও অনেক ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধার দেশ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই ভারতের গৌরবের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন! কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল ঃ

জাহিজ (Jahiz) একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন। তিনি ৮৬৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি বলেন, ভারতে রীতিমত জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা হ'ত। এখানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিল। ভাল ভাল চিকিৎসক ছিলেন এদেশে। বহু মেধাবী ছাত্র পাথরের মূর্তি প্রস্তুত করতে জানত। তারা চিত্রাঙ্কনেও পটু ছিল। এ সব বিষয়ে তারা ছিল অনন্যসাধারণ। তারা সুন্দর সুন্দর তরবারি তৈয়ার করতে পারত। তারা সঙ্গীত চর্চায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। তাদের কবিত্ব শক্তি ছিল অসাধারণ। বাগ্মিতায় তারা সুপটু ছিল। ভারতের আর্যগণ ছিল সুদর্শন। তাদের ছিল দীর্ঘ ঋজু দেহ। তারা আরও বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিল, যাহা চীন ও জাপানের লোকেরা ছিল না। তারা সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করত। তাদের নারীগণ ছিল অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ। দশম শতাব্দীর লেখক মাসুদী ভারতের অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলেন যে সে যুগের হিন্দুরা সাধারণভাবে মদ্যপান থেকে বিরত থাকত। যারা মদ্যপান করত, তাদেরকে নিন্দা করা হ'ত। কোন কোন রাজা মদ্যপান করতেন সত্য। কিন্তু তিনি প্রজাকুলের শ্রদ্ধা লাভ করতে পারতেন না। সাধারণ লোকেরও এ ধারণা ছিল যে, রাজা যদি

মদ্যপান করেন তবে তাঁর মন দূষিত হয়ে পড়বে। এরূপ মদাপ রাজা দেশ শাসনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতেন।

এর পরে যে মহাপণ্ডিত ভারতের মহিমা গরিমার কথা উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, তাঁর নাম আল-বেরুনী। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক দূতের মত কাজ করেছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে একটা উদার আদর্শের কথা শিক্ষা দিয়েছেন। ''আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ' অপর ধর্ম মিথ্যা''—এ ধরনের কথা তিনি বলেন নি। নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান দ্বারা তিনি বিভ্রান্ত হন নি। তিনি হিন্দু ধর্মের চিন্তাকে বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে সে যুগেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কত ব্যাপক ও প্রসারিত ছিল। সেইজন্য তাঁকে বলা হয় যে তিনি ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইন্দোলজিষ্ট—ভারতবিদ্। ভারতের জীবনে, কর্মে ও কীর্তিকলাপে যা ভাল ও গ্রহণযোগ্য তা তিনি অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁর এই সব রচনা পাঠ করে সুলতান মহমুদ মুগ্ধ হন। তাঁর এই সব রচনা অন্যান্য লেখকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর রচনাবলীর অবশ্যম্ভাবী ফল এই হল যে, সে যুগের অনেক ফারসী-অভিজ্ঞ লেখক ভারত সম্বন্ধে তাঁদের পূর্বতন মত পরিবর্তন করেন। সে সময় যে সব ফারসী অভিজ্ঞ লেখক ভারতে বসবাস আরম্ভ করেন তাঁরা ভারতবর্ষকে ভালবাসতে শুরু করেন। ভারতকে তাঁরা শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলেন। আলবেরুণীর পুস্তকাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বহু ফারসী ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ পুলকিত হয়েছেন। এবং তাঁদের আবেগ প্রকাশ করতে ইতস্ততঃ করেন নি। উদাহরণস্বরূপ ''তা জুল মা আসির'' গ্রন্থের লেখকের নাম উল্লেখ করতে পারি। এই গ্রন্থের লেখক ইন্দ্রপ্রস্থের দুর্গের বিশাল আকৃতি দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি বলেন যে, উচ্চতায় ও শক্তিতে আশপাশের সাতটি দেশের কোথাও এর সমতুল দুর্গ নাই। তিনি তৎকালীন দিল্লীকে ভারতের ''নগর জননী'' এই আখ্যা দিয়েছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই যে বিস্ময়কর আবেগ তা পরে ইরাণীয়দেরকে ভারতের জীবন দর্শন ও পরিবেশকে ভালবাসতে শিক্ষা দিয়েছিল। আর একজন কবি শিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি আমীর খুসরু। আমীর খুসরু দীর্ঘকাল দিল্লীতে বাস করেছিলেন। যখন তিনি দিল্লী ত্যাগ করে অন্য কোথায় যেতেন, তখনই তিনি আবেগভরে কেঁদে ফেলতেন। বাইরে গেলেও তিনি বারবার দিল্লী

নগরীর প্রশংসা করতেন। দিল্লীকে তিনি Arch of India বলতেন। তাঁর মতে দিল্লী যেন এই পৃথিবীর মধ্যে একটা "স্বর্গরাজ্য"। ভারতের তরুলতা বৃক্ষ ফুল ফলের কথাও তিনি লিখতে ভুলেন নি। এই সব ফুল ফল উদ্যানকে সুশোভিত করে ছিল। তিনি ভারতের নারীজাতিরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ভারতের নারী জাতির প্রতি তাঁর এই যে অজস্র প্রশংসা তা তাঁর ভারত প্রীতির অন্যতম নিদর্শন। তিনি একস্থানে বলেছেন যে তুর্কিস্থান ও অন্যান্য স্থানের নারীগণের সৌন্দর্য তিনি দেখেছেন। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা খুব তীক্ষ্ন দৃষ্টি সম্পন্না। তারা কতকটা কটু মেজাজের। তিনি রাশিয়ান ও টার্কিশ নারীর সৌন্দর্য দেখেছেন। তাঁর মতে সে সব দেশের নারী রুচিহীন। তাদের মধ্যে বশ্যতা ও নম্রতার ভাব কম। তিনি তাতার দেশের নারীদের সৌন্দর্যকে লঘু করে দেখেছেন। তাঁর মতে তাদের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির অভাব আছে। তিনি কোহস্থানের নারীর সৌন্দর্য দেখেছেন। তাতেও একটা গুণের অভাব আছে। খোকস্থানের নারীর সৌন্দর্যে কোন আকর্ষন নেই। সে সৌন্দর্য গন্ধহীন। সমরকন্দ ও কান্দাহারের নারীদের সৌন্দর্যকেও তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন নি। কারণ এ সব সৌন্দর্যের মধ্যে মাধুর্য নেই। মিশরের রজত ধবল সৌন্দর্যেও কোন মোহাকর্ষণ নেই। কিন্তু তিনি ভারতের dark beauty (কৃষ্ণকলি)র মধ্যেও দেখেছেন একটা charming grace বা মুগ্ধকারী মাধুর্য। একটা elegance, একটা মার্জিত পারিপাট্য।

এ ত' হল ভারতের নারীদের সম্বন্ধে তাঁর অভিমত। তাঁর রচিত মসনভীতে তিনি সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা জানতেন। সেইজন্য এই ভাষার বহু বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন যে সংস্কৃত ভাষা ফারসী ভাষার চেয়ে কোন অংশে নগণ্য নয়। তাঁর একখানা পুস্তকের নাম "নুহ সিফির" (Nuh Siphir)। এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন যে সংস্কৃত ভাষা উজ্জ্বল মুক্তার মত বিশুদ্ধ। তিনি হিন্দী ভাষাকেও ভালবাসতেন। তিনিই বোধ হয় প্রথম কবি যিনি ফারসী ও হিন্দীর মধ্যে একটা Synthesis স্থাপনের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি হিন্দী ভাষায় বহু কবিতা রচনা করেন। তিনি হিন্দী ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করেছেন। খুসরু হিন্দুধর্মের উজ্জ্বলতর দিকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন

যে, এক ঈশ্বর থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। ঈশ্বরের একত্ব ও অনন্তত্ব সম্বন্ধে হিন্দুদের পরিপূর্ণ ধারণা ছিল। তাদের ধর্মচেতনা dualist অথবা দ্বৈতবাদী থেকেও উন্নত। খুসরু হিন্দুদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সতীদাহ প্রথার কথাও উল্লেখ করেহেন। তিনি সেইসব মেয়েদের কথা বলেছেন যারা স্বেচ্ছায় স্বামীর জন্য মরণ বরণ করতেন এবং একটুও কাতর হননি। এই আত্ম-বিসর্জনের আদর্শ দেখে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছেন যে তিনি অনুভব করলেন যে যদি তাঁর নিজের ধর্ম অনুমতি দিত তবে মুসলমান নারী এইভাবে আত্ম-বিসর্জন করতে কুণ্ঠিত হত না। তিনি আরও লক্ষ্য করেছেন যে হিন্দুদের মধ্যে একটা আন্তরিকতা ছিল ও ধর্মের প্রতি একটা গভীর নিষ্ঠা ছিল। তাঁদের এই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাকে অনুকরণ করার জন্য তিনি তাঁর ধর্মাবলম্বীদেরকে আহবান করেছেন। খুসরু নিজে প্রতিমা পূজা করতেন না। তবুও তিনি হিন্দুদের প্রতিমা-পূজার নিন্দা করেন নি। তাঁর মতে প্রতিমা পূজার পশ্চাতেও একটা দর্শন আছে। এই প্রতিমা হিন্দুদের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতীক মাত্র।

খুসরুর আর একটা মসনভী আছে; তার নাম "নুহ সিফির"। এই গ্রন্থে তিনি ভারতের আবহাওয়া ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। তিনি কল্পনা আবেগ ও আন্তরিকতার সহিত ভারতের নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের বিষয় সম্বন্ধে লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে এই দেশে জ্ঞান ও বিদ্যা ব্যাপকভাবে প্রসারিত। এখানে ভাষায় প্রকাশভঙ্গী পরিষ্কার ও নির্ভুল। এখানে গণিতশাস্ত্র অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। এখানকার পণ্ডিতগণ নির্ভুলভাবে গণিতের সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। ফারসী ভাষায় "কালিলা ও দামনা" নামে যে গ্রন্থ লিখিত হয়েছে তার মূল উৎস এই ভারতেরই একটি সংস্কৃত পুস্তক। জ্ঞান ও শিক্ষার এই আশ্চর্য মূল গ্রন্থখানি ভারতেই রচিত হয়েছিল। Chess বা দাবা খেলা বলে যে খেলাটি আজ সারা বিশ্বে প্রচলিত তাও এই ভারতেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। অন্যান্য খেলার চেয়ে এই দাবা খেলাটি আজ আন্তর্জাতিক খেলা বলে পরিগণিত। ভারতের সংগীত বিদ্যারও তিসি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন যে, অন্য কোন দেশের সংগীত ভারতের সংগীতকে অতিক্রম করতে পারে না। ভারতের সংগীত মানুষের হৃদয় ও আত্মাকে আলো-কিত করে। ভারতের সংগীত বনজঙ্গলের সন্ন্যাসীদেরকেও মোহগ্রস্ত করতে

পারে। তিনি নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এবং বোধ হয় সেইজন্য ইরাণীয়ান সঙ্গীত ও ভারতীয় সংগীতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ তিনি সংগীত শিল্পে sound and sensation, ধ্বনি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। তিনি ভারতের বীণার সহিত ইরাণের তানপুরার একটা মিলন ঘটিয়ে সিতার উদ্ভাবন করেছেন। বলা হয় যে তিনি মৃদঙ্গকে তবলার সহিত মিলন ঘটিয়ে একটা নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

খুসরু নিজে একজন সৎ মুসলমান ছিলেন। তাঁর নিজের ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না। ধর্ম ব্যাপারে তাঁর মত্ ছিল অত্যন্ত উদার। তিনি ছিলেন দেশভক্ত। ভারতকে নিজের দেশ বলে মনে করেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন। ভারতের জীবন-ধারার সহিত মিশতে পেরেছিলেন। সেইজন্য তিনি ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের বৈচিত্র্যকে ধরতে পেরেছিলেন। ভারত সম্বন্ধে তাঁর এই সব অভিজ্ঞতা তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি বলেন এই যে উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ভারতকে ভালবাসতে সক্ষম হয়েছেন, তা তাঁর পয়গম্বর হজরত রসুলের শিক্ষার পরিণত ফলস্বরূপ। কারণ হজরত রসুল করীম বলেছেন, "দেশভক্তি ঈমানের অঙ্গ"।

কবি খুসরুর এই ভারত প্রীতির প্রভাব পরবর্তী যুগের বহু কবি শিল্পীর উপর পতিত হয়েছিল। কবি "ইসামী" (Isamy) মধ্যযুগের একজন কবি। খৃষ্টীয় ১৩১১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীর সুলতানদের আমলে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য লেখক বলে গণ্য হয়েছিলেন। কবি ফিরদৌসির মত তিনি একটি "শাহনামা" রচনা করেন। তাঁর এই মহাকাব্যে বার হাজার (১২০০০) শ্লোক আছে। তাঁর সেই মহাকাব্যের নাম "ফতুহুস সালাতিন"। ইহাতে কালানুক্রমিকভাবে ভারতের গত তিন হাজার বছরের ইতিহাস আছে। ফিরদৌসির শাহনামার অনুকরণে এই গ্রন্থ লিখিত। অতীত যুগের ভারতের শাসকবর্গের নাম ও কীর্তিকলাপকে নিয়ে অনবদ্য ভাষায় তিনি এই কাব্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। কবি যে ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন তার সুস্পষ্ট নিদর্শন এই গ্রন্থে আছে। কবি ইসামী তাঁর কবিতায় ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

এই যুগের কয়েকজন কবি ফারসী কবিদের নিকট নিবেদন করে বলেছেন, তাঁরা যেন ভারতের সহজ সরল প্রকাশ ভঙ্গীকে ও শব্দ প্রয়োগকে ফারসী

ভাষায় রূপ দেন। এই উপদেশ অনেকক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছিল। তার ফলে সে-যুগের শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা Indianised ভারতীয় ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। তাঁরা হিন্দুদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলেন। সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলকের দৃষ্টি ভারতের বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। তিনি ১৩৫১ থেকে ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁরির সময় হিন্দুদর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ এবং এই ধরনের বহু সংস্কৃত গ্রন্থাদি ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়। এই সব গ্রন্থ যিনি অনুবাদ করেন, তাঁর নাম ইজ্জাজুদ্দিন খালিদ খানিম। এই গ্রন্থের নাম "দালায়েলে ফিরোজশাহী"। এই সময় আরও কয়েকটি সংস্কৃত বই ফারসীতে অনূদিত হয়েছিল। এরূপ একটি পুস্তকের নাম "বৃহৎ-সংহিতা"। এটা জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বই। ভেষজ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে দুচারটি বইও ফারসীতে অনূদিত হয়। এরূপ একটি বইএর নাম "তিব্বিয়ে সেকান্দারী"। এইসব সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে ফারসী অনুবাদ ইহাই প্রমাণ করে যে সে-সময় যে সব ফারসী ভাষী ব্যক্তি এ-দেশে বসবাস আরম্ভ করেন, তাঁদের উপর ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। উভয় সম্প্রদায় একটা সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিটি মনে পড়ে—"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।" বস্তুতঃ ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে ইন্দো-ইরাণীয়ান জাতি পারস্পরিক আদান প্রদান করেছিল। তার ফলে ভারত ও ইরাণের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে বহু বিষয়ে বিভিন্নতা থাকলেও, এই বিভিন্নতার তীব্রতাকে হ্রাস করতে সহায়তা করেছিল।

ইন্দো-ইরাণীয়ান সম্পর্কের প্রথম যুগে কতকগুলি মুসলিম মিস্টিকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের জীবন ছিল অত্যন্ত মহৎ। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তাঁরা উচ্চমার্গে উপনীত হয়েছিলেন। এইসব মুসলিম মিস্টিকগণ প্রচলিত ধর্মের আচার-বিধি অপেক্ষা ধর্মের সার ও মৌলিক আদর্শের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রভাবে ধর্মবিশ্বাসের কঠোরতা হ্রাস পেতে লাগল। শুধু তাই নয়—এই সব মুসলিম মিস্টিকগণ ভারতের হিন্দুদের প্রথা, অনুষ্ঠান ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধার ভাব প্রদর্শন করতে উৎসাহিত করেছিলেন। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি সেইরূপ একজন মহান সাধক যিনি হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের প্রিয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১২৩৪

খ্রীষ্টাব্দে। এখনও প্রতি বছর হিজরী "রজব" মাসে তার উরস্ হয়। এই উরস্ বা ধর্ম-মহাসম্মিলনে হিন্দু-মুসলমান সকলেই যোগান করেন। এ দেশের লোকের হৃদয়-রঞ্জন করতে তিনি সমুচিত উৎসাহ দান করেন। খাজা বখতীয়ার বাকী আর একজন সাধক। তিনি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে মানবতার আদর্শ প্রচার করেন। খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (১৩২৪) আর একজন সাধুসন্ত মানুষ, যিনি দরিদ্র, উৎপীড়িত অভাবগ্রস্ত মানুষকে সর্বপ্রকার সাহায্য করার দিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দান করেন।

এই প্রসঙ্গে নাসিরুদ্দিন চিরাগীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর জীবন ছিল মানুষের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গের জীবন। সমসাময়িক কালে শেখ সারফুদ্দিন এহিয়া মানবধর্মের কথা প্রচার করেন। তিনি pantheism আদর্শের সমর্থক ছিলেন। এই আদর্শ অনুসারে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট জীবের প্রতি সমান ভালবাসার ভাব পোষণ করতে হয়। তিনি সার্বজনীন প্রেমের উপর গুরুত্ব দেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করতে হবে—এই ছিল তাঁর প্রধান উপদেশ। তিনি তাঁর এক শিষ্যকে লেখেন, "প্রার্থনা, উপবাস স্বেচ্ছায় উপাসনা করা—এসব ভাল কাজ। কিন্তু অপরকে সুখী করার চেষ্টা তার চেয়েও অধিকতর ভাল কাজ।" অপর একটি পত্রে তিনি লেখেন, "প্রভুর নিকট যাওয়ার বহু পথ আছে। কিন্তু সবচেয়ে ছোট পথ হচ্ছে উৎপীড়িতকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং মানুষের হৃদয়কে আরাম দেওয়া।" তিনি তাঁর সমসাময়িক শাসকবর্গকে এই বলে সাবধান করেছেন, "প্রজাবর্গকে ভাল করে খাওয়াতে হবে, অন্নহীনকে অন্ন দিতে হবে এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে হবে। আশ্রয়হীনের পুনর্বাসন করতে হবে। অপক্ষপাত-ভাবে সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি সুবিচার করতে হবে। কারণ এক মুহূর্তের সুবিচার তিন হাজার বছরের প্রার্থনা অপেক্ষা ভাল কাজ।" একজন সুফী সাধক শেখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গোহী (১৫৩৭) তৎকালীন সম্রাট সেকেন্দার লোদীকে সব সময় প্রজাপুঞ্জের উপর সুবিচার করতে উপদেশ দেন। এই ধরনের উপদেশ তিনি মোগল-সম্রাট বাবরকে দেন। তাঁর প্রধান কথা "সুবিচার করতে হবে।" তিনি সকলকেই বলেন, "জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করতে হবে।" "সবই ঈশ্বরময়"—এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি একস্থানে বলেন, "কেন এই গোলমাল ও গণ্ডগোল ? দেশে মুসলমান আছে, ও অমুসলমান আছে ; তারা এ-দেশেই

থাকবে। কেহ একপথে যায়, আর একজন অন্যপথে যায়। সকলেই একই সত্তার বিভিন্ন মূর্ত্তি।” যখন মিস্টিক চিন্তা সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল, তখন একটা আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগ্রত হ'ল। তখন ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা একাত্ম ভাব জাগ্রত হতে লাগল। এই ধরনের ভক্তি ধর্ম ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন সম্প্রদায়কে মিলনের দিকে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, যা জাতিধর্ম ও বর্ণের পার্থক্যকে দূর করতে সাহায্য করল। এইসব মনোভাবই ধীরে ধীরে সকলকে ঈশ্বর-প্রেম ও মানুষ-প্রেমের ভাব দ্বারা একত্র করতে উৎসাহ দিল এবং একটা cosmopolitan spirit সর্বমানবীয় ভাব জাগ্রত করল। সুফিজম বা সুফি মতবাদ ইন্দো-পার্শিয়ান সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ ছিল দেশপ্রেমের যুগ। এই দেশ-প্রেম ভারতের ফার্সীভাষী লোকদেরকে প্রভাবিত করেছিল। তারা ভারতবর্ষকে অন্তরের সহিত ভালবাসত। মোগল-সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময় মহাভারত, রামায়ণ, অথর্ববেদ, হরিবংশ, লীলাবতী—এই সব গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। 'তাজাক' (Tajak) একখানা জ্যোতির্বিদ্যার বই। এ বই এরও ফারসী অনুবাদ হয়েছিল। তাছাড়া মহাভারত ও রামায়ণের ফারসী অনুবাদের পুস্তকে প্রয়োজনমত নানা প্রকার চিত্র দেওয়া হয়েছিল। এই সব চিত্রে ভারতের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতের সভ্যতা-সম্বন্ধে সে-যুগের মুসলিম সুধীদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল, এই সব চিত্রে তার নিদর্শন আছে। আব্দুল গণি বাদাউনি সে-যুগের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি একটি সংস্কৃত পুস্তকের ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন ;—সেই গ্রন্থের নাম "সিংহাসন বত্তিসি"। এর ফারসী নাম "নামায়ে খিরদ আফজা"। এই গ্রন্থে আছে মালওয়ার রাজা বিক্রমাদিত্যের জীবনের বত্রিশটি অসমসাহসিক ঘটনাবলীর বিবরণ। এ ছাড়া বাদাউনি আর একটি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেন—তার ফারসী নাম "বাহরুল আসমর" অর্থাৎ Ocean of fruits —ফলের সমুদ্র। সম্রাট আকবরের "দীনে এলাহী" এই যুগের একটি উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা যে আকবরের জীবনের একটা মহান-প্রচেষ্টা ছিল, "দীনে এলাহি" তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আকবরের রাজসভার নবরত্নের মধ্যে অন্যতম ছিলেন "আবুল ফজল"। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত হিন্দুদের

শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কোন অভাব ছিল না। তিনি হিন্দু ধর্মের বহু বিষয় তাঁর রচিত "আইনে আকবরী" গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জলি এবং আরও নানা বিষয়ের উপর সহানুভূতিশীল মন্তব্য করেন। হিন্দুদের বিভিন্ন ধরনের পূজা-পদ্ধতি পাপপুণ্য সম্বন্ধে তাদের ধারণা, তাদের তীর্থস্থান, তাদের সামাজিক রীতিনীতি, প্রথাপদ্ধতি, তাদের উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ বিধি এই ধরনের আরও বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে তাঁর এই গ্রন্থে। তাঁর গ্রন্থে বর্ণিত ঃই সব বিষয় যদি পৃথক পৃথক ভাবে পুস্তকারে প্রাকশিত হয়, তবে তা থেকে বহু মূল্যবান বিষয় জানা যাবে। বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অধিকতর নিকট সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাই তিনি বলেন যে, "এটাকে আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি যে, হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘ-দিনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে সকলের নিকট উপস্থিত করব। তাদের ভাল অভ্যাস ও প্রথাসমূহকে এমনভাবে উপস্থাপিত করব যেন সকলকেই তা উপভোগ করতে পারে। তাদের মধ্যে বর্তমানে যে সব বিবাদ-বিসম্বাদ ও বাক্-বিতণ্ডা আছে, তা দূর হয়ে যেতে পারে। তাদের বিরাগভাব ভালবাসায় রূপান্তরিত হতে পারে। আবুল ফজলের দৃষ্টিভঙ্গী যে কত উদার ছিল, তা এই উদ্ধৃত অংশ থেকে বুঝা যাবে। কাশমীরের একটা ফলকে লেখা আছে—"হে ঈশ্বর, প্রত্যেক মন্দিরে আমি এমন সব লোককে দেখি, যারা তোমাকেই অনুসন্ধান করে এবং প্রত্যেক ভাষাতে আমি শুনি লোকে তোমারই প্রশংসা করে। বহু-ঈশ্বরবাদ ও ইসলাম তোমাকেই অনুসন্ধান করে। তোমার সমতুল আর কেহই নাই। তিনি আরও বলেন যে যারা সত্যকারভাবে ঈশ্বরগত-প্রাণ তাদের সহিত ধর্মবিদ্রোহী অথবা ধর্মান্ধদের কোন সম্পর্ক নাই। কারণ, তাদের কেহই তোমার পর্দার পশ্চাতেও দাঁড়াতে পারে না। কি ধর্মদ্রোহী, কি ধর্মান্ধ—কেহই ঈশ্বর যাবে না। কিন্তু গোলাপের পাপড়ির মালিক হচ্ছে সুগন্ধ বিক্রেতার মালিক।"

মোগল-সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ফারসীভাষী পণ্ডিত ও ইন্দোলজিস্টগণ সাহিত্যে বহুভাবে দান করেছেন। শাহজাহান ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি বিপুল আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। তিনি নায়ক "বাক্ষুর" হাজার ধ্রুপদকে পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তিনি অপর একটি গ্রন্থ "প্রবোধচন্দ্রোদয়"কে ফারসীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। অনুবাদকের নাম 'তুলসী বনমালী দাস"। তাছাড়া এই সম্রাটের প্রেরণায় ইব্নে হারকরাণ নামক একজন ফারসী অভিজ্ঞ লেখক রামায়ণ গ্রন্থটি অনুবাদ

করেন। ভাস্করাচার্যের বীজগণিতের অনুবাদ করেন আতাউল্লাহ রশীদ। মৌলানা আব্দুর রহমান (১৬৩১ খৃষ্টাব্দে) মহাদেব ও পার্বতীর কথোপকথন ফারসীতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থের নাম "মিরাতুল মখলুকাত"। এই একই লেখক আর একখানা বই লেখেন, তার নাম "মিরাতুল হাকায়েক"। এই গ্রন্থটি ভগবদ্গীতার সারাংশ বিশেষ। শেখ নূর মহম্মদ আর একজন ফারসী লেখক যিনি "মনোহর ও মধুমালতীর" একটি প্রেমকাহিনী নিয়ে লিখিত গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ করেন, অথবা উক্ত গ্রন্থের ঘটনাকে অবলম্বন করে এই গ্রন্থ লেখেন। রচনার তারিখ ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দ।

এই যুগের ইন্দো-ইরাণীয়ান সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোহ। তাঁর সাংস্কৃতিক রচনাবলী বহু ইন্দোলজিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁরা সহজেই তাঁর রচনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। দারা শিকোহ কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসীতে অনুবাদ করেন যথা ঃ—ভগবৎগীতা, যোগবাশিষ্ট, উপনিষদ। তাঁর অনূদিত উপনিষদের ফারসী নাম "সিররে আসরার" (ভেদের ভেদ)। দারা শিকোহের এই ফারসী অনুবাদকে Anquetil du Peron আঁকেতিল দু পেরোঁ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দারা শিকোহ বলেন যে ইহা ঈশ্বরের একত্ববাদের আদর্শের মহাসাগর। ভারতীয় জাতির মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করার জন্য তিনি আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তার নাম "মাজমাউল বাহরায়েন," অর্থাৎ দুই সাগরের সংযোগ-কেন্দ্র। ইহা লিখিত হয় ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলেন যে হিন্দু-মুসলমানদের metaphysical ধারণা প্রায় একই রূপ। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। অনেকে এই মত পোষণ করেন যে যদি দারা সিংহাসন লাভ করতে পারতেন, তাহলে আকবর যে জাতীয় রাজতন্ত্র national monarchy গঠন করতে চেয়েছিলেন, তা সার্থক হ'ত। কিন্তু ভাগ্য তা হতে দিল না। তবে ভারত ও ইরাণের বিষয় নিয়ে উদার আলোচনার আগ্রহ সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ও অস্তমিত হয়নি। এই যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা, উদারভাবে দুই ধর্মকে বিচার করার প্রচেষ্টা, তা অক্ষুণ্ণ ছিল। আওরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহ হিন্দুদের শাস্ত্রাদি ভালবাসতেন। তিনি সঙ্গীতও ভালবাসতেন। শাহ আজমের জন্য মির্জা খান বিন ফারুক দীন মহম্মদ একখানি গ্রন্থ লেখেন, তার নাম "তুহফাতুল হিন্দ"। তিনি

আর্টের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন, যথা—ছন্দ-প্রকরণ, মিলনাত্মক কাব্য, অলংকার, শৃঙ্গার রস, যৌন-সমস্যা, physiognomy ইত্যাদি। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের চতুর্থ বছরে যোগবাশিষ্ট গ্রন্থের আর একটি অনুবাদ হয়। "রাগদর্পণ" রচিত হয় আওরঙ্গজেবের দরবারের একজন সভাসদ কর্তৃক। ইহা ভারতীয় সঙ্গীতের উপর একটা ক্লাসিকাল গ্রন্থ। এতে আছে সমসাময়িক যুগের সঙ্গীত ও গায়কের পরিচয়। সংগীতের নূতন সুর ও নানা প্রকার melodyর উপর আলোকপাত করা হয়েছে এতে। আওরঙ্গজেবের অন্যতম সভাসদ মির্জা রোশন জামির সংগীত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

এই সব গ্রন্থ ও তাদের উপর বিবিধ প্রকার আলোচনা ইহাই প্রমাণ করে, সে যুগে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইন্দো-ইরাণীয়ান কালচারের মধ্যে যথেষ্ট সমন্বয় হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু-ঐতিহাসিক কবি ও ভাষাতত্ত্ববিদ নানা গ্রন্থ রচনা করে ইন্দো-পার্শিয়ান সাহিত্যের ভাণ্ডারে নানা উপহার দান করেন। সুপণ্ডিত বৃন্দাবন ফারসী ভাষায় একটি গ্রন্থ লেখেন ; তার নাম "লুবুওয়াত্তারিখ"। ঈশ্বরদাস রচনা করেন আর একটি ফারসী পুস্তক, নাম "ফাহুহাতুল আলমগীর"। ভীমসেন লেখেন "দিলকুশা"। তিনি আর একখানি গ্রন্থ লেখেন, নাম "খোলসাতুত তাওয়ারিখ"। এসব গ্রন্থও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই লিখিত হয়। একটা অভিযোগ প্রায় উঠে থাকে যে হিন্দু পণ্ডিতগণ ঠিকভাবে ইতিহাস লিখতে জানেন না। অবশ্য গিবন, মমসেন, গিজোর মত ঐতিহাসিক এদেশে এ-যুগে আবির্ভূত হননি। কিন্তু তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে মোগলযুগে কতিপয় হিন্দু ঐতিহাসিক উচ্চাঙ্গের ইতিহাস রচনা করেছেন। পরবর্তী যুগে কয়েকজন হিন্দু-ঐতিহাসিক ইতিহাসের উপর মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছেন। মোগলদের যুগের এই সব ইতিহাস পাঠ করলে তাদের ইতিহাস-চেতনা সম্বন্ধে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপ বিদ্বেষভাব সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে তাঁরা কেউ ইতিহাস লেখেন নি। তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেল—মিজান লাল আফরিন, মোহনলাল আলিম, ঈশ্বরীদাস আরাম, চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ, রাই মনোহর, ইঁহারা ফারসী ভাষায় ইতিহাস রচনা করেন। ভারতীয় লেখকগণ যে বিদেশী ভাষায় উচ্চাঙ্গের পুস্তক রচনা করতে পারেন ইঁহারা তার প্রমাণ দেন। বাহারা ই আজাম, নওয়াদিরুল মুসাদির, জওয়াহিরুল হুরমর্ত, এই বইগুলি লেখেন টেকচাঁদ বহর। "মুসতালেহা

ই শাওরা" এই বইটি লেখেন শিয়ালকোটি মানওয়ারাম। "শির ও শকুর" নামক আর একটি বই লেখেন গঙ্গাকিষাণ। "গামজুলল্গাত" বইখানি লেখেন গিরীধারীলাল। উপরে উল্লিখিত বইগুলি শব্দকোষ ও অভিধানের বই। এই ধরনের বই থেকে ইহাই বুঝা যায় যে, ভারতীয় হিন্দু ও ইরাণীয়ান মুসলমানদের মধ্যে সমান্তরালভাবে মেলামেশা চলেছিল। ভারতীয় হিন্দুগণ ইরাণের ভাষার চর্চা করতেন। আর ইরাণীয় মুসলমানগণ ভারতীয় দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ ও সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয় নিয়ে রীতিমত আলোচনা করতেন ও ভাবের আদান প্রদান করতেন। দেখা গেছে যে, অনেক হিন্দু লেখক ফারসী ভাষায় ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে বহু পুস্তক রচনা করেছেন। এই গ্রন্থাদি প্রমাণ করে যে হিন্দু লেখকগণ তাদের স্বদেশবাসী ভারতীয় মুসলমানদের সংস্কৃতি, ধর্ম সমাজনীতির মর্মমূলে প্রবেশ করতে সচেষ্ট ছিলেন। পারস্পরিক অবিশ্বাস, ঈর্ষা-বিদ্বেষ, এই সব এল অনেক পরে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নানা বিপর্যয় দেখা দিল। চারিদিকে গণ্ডগোল ও গৃহবিবাদ আরম্ভ হ'ল। ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংসা, একের উপর অন্যের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা এসব প্রকটিত হয়ে উঠল। শত শত বছর ধরে ভারতে যে ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তা যেন স্তিমিত হতে লাগল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল, এই সব গণ্ডগোল সেই যোগসূত্রকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে তিক্ত করে তোলার জন্য নানা অবস্থার সৃষ্টি হ'ল। এই সময় এলেন নাদীর শাহ, তারপর এলেন আহমদ শাহ আব্দালী। তাঁরা বিজয়ী বেশে এসেছিলেন এবং বিজয়ের গৌরবে উল্লসিত হয়ে অনেক কিছু বিধ্বস্ত করে দিলেন। আহমদ শা আব্দালীর আক্রমণের ফলে মহা-রুদ্রশক্তি চূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে গেল। উত্তর ভারতে কোন শক্তিশালী রাজা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেন না। চারিদিকে অরাজকতা, অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা। এই সুযোগে বৃটিশ শক্তি ভারতবর্ষ গ্রাস করে নিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলব, "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী, রাজদণ্ড রূপে।"

চারিদিকে যখন গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা তখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে একটি রজত রেখা দেখা দিল। এই দুর্যোগপূর্ণ যুগেও কয়েকজন উচ্চমনা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাথা স্থির করে দাঁড়ালেন এবং দেশের মধ্যে স্বদেশ-

প্রেমের ভাবধারা প্রবাহিত করবার চেষ্টা করেন। তাঁরা এইসব বিভ্রান্তি, গণ্ডগোল ও অবিশ্বাসের মধ্যেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেম প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মানুষ ছিলেন মির্জা মজহর জান জানান (১৬৮৯–১৭৮১)। তিনি প্রাণবন্ত ধর্ম ও মানবীয় সৌন্দর্যের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি সংকীর্ণ মনোভাব দ্বারা বিভ্রান্ত হননি। দেশ ও জাতির মঙ্গল করার স্বপ্ন যাঁরা দেখেন এবং মানুষকে যাঁরা সৎশিক্ষা দিতে চান তাঁদের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। তিনি মুসলমানদেরকে বললেন, বেদকেও ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করা উচিত। যেমন খৃষ্টান ও ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থকে ভালবাসা উচিত, সেইরূপ বেদকেও ভালবাসতে হবে। কারণ, বেদও অনুপ্রাণিত গ্রন্থ। তিনি বলেন যে চতুর্বেদ অনুপ্রাণিত হয়েছিল মানুষের কর্তব্য নির্ধারণ করতে। ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বাণীই হচ্ছে বেদ। এই ব্রহ্মাই জগত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরের বাণী পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের নিকট এসেছিল! সাধারণতঃ মুসলিম সমাজ চার প্রকার ধর্মশাস্ত্রের কথা বলে; যথা তাওরাত, জব্বুর, ইনজিল ও কোরআন। মুসলমান এই চারটি ধর্মগ্রন্থকে ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলে স্বীকার করে। যারা এই চারটি ধর্মশাস্ত্রকে স্বীকার করে তাদেরকে বলা হয় "আহলে কেতাব"। তাঁর মতে হিন্দুদের বেদও সেইরূপ একটা অনুপ্রাণিত ধর্মশাস্ত্র। সুতরাং বেদ-ভক্ত হিন্দুদেরকেও "আহলে কেতাব" বলে মনে করা উচিত। হিন্দুরা প্রতিমা পূজা করে। তারও তিনি একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে হিন্দুদের প্রতিমা হচ্ছে একটা আদর্শের প্রতীক। তাদের এই প্রতিমা পূজা মিস্টিকদের শিক্ষা ও নীতির মত। মিস্টিকদের মতে ঈশ্বরকে দেখতে হবে in the concrete and the abstract অর্থাৎ বাস্তব আকারে ও আদর্শের আকারে মানুষের ঈশ্বর দর্শন হয়। হিন্দুরাও তাই করে—অনন্ত ঈশ্বরকে একটা মূর্তির মাধ্যমে পূজা করলেও হিন্দুরা আসলে সেই abstract বা নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরকেই পূজা করে।

হিন্দু মুসলিম মিলনের দূত স্বরূপ আর একজন মহান লেখকের নাম করা যেতে পারে। তাঁর নাম গোলাম আলি আজাদ বেলগ্রামী। তিনি ১৭৮৫ সালে আবির্ভূত হন। তিনি নিজে সংস্কৃত ভাষা জানতেন এবং যে সব মুসলিম কবি সংস্কৃত চর্চা করতেন তাদেরকে উৎসাহ দিতেন। এ-সম্পর্কে তাঁর দুখানা পুস্তক আছে; যথা "সারভি আজাদ" এবং "ইয়াদে বরদা"। ভারতের লেখকগণ ফারসী ভাষার চর্চা ক'রে

যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, এই দুটি গ্রন্থে তিনি তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বেলগ্রামী সাহেবের লিখিত একটি আরবী গ্রন্থের নাম "সাবহাতুল মারজান।" এই গ্রন্থেও তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে ভারতবর্ষকে স্বর্গের প্রতীক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন হিন্দু পণ্ডিতের কথা বলেছেন, তাঁর নাম দুর্গাদাস। এই দুর্গাদাস "মাখজানুল আখলাক" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। তিনি এই গ্রন্থে উদারতা ও সার্বজনীনতার কথা প্রচার করেছেন। তিনি বলেন সর্ব ধর্মই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে; —সেই ঈশ্বর যিনি জগতের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা। তিনি সমস্ত শ্রেণীর মানুষের রক্ষক। উদ্যানে যেমন বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ ও ফুল থাকে; তেমনি এই জগত উদ্যানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে। কিন্তু তারা একই ঈশ্বরের সৃষ্ট। ধর্মের মধ্যে যেমন বিভিন্নতা দেখা যায়, তা সেই ঈশ্বরের কাজ। ধর্মে নানা কারণে বিভিন্নতা সৃষ্ট হয়ে থাকে। ধর্মে ধর্মে মারামারি কাটাকাটি হয়। তবুও এক এক সময় মানুষ পরস্পরের সহিত মিলিত হয়ে সুখের সংসার রচনা করে। ভারতের মধ্যযুগের একটা অধ্যায় এখানে উপস্থিত করা গেল। আশা করি, পাঠকগণ এর থেকে উপকৃত হবেন এবং সমন্বয়, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বস্থাপনের কথা চিন্তা করবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট মুসলমানের ঋণ

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন হইতে অদ্যাবধি এই দেড়শত বৎসরের ইতিহাস বাঙালীজাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে দিন বাঙালী ছিল নিদ্রালস; তাহার সাহিত্য ও ভাষা ছিল দুর্বল, উচ্চভাব বহনের অযোগ্য। দেশের কোথাও কর্মচাঞ্চল্য লক্ষিত হয় নাই। আর আজ বাঙালী নানা বিষয়ে উন্নতি-লাভ করিয়াছে,—সে জাগিয়াছে। তাহার সাহিত্য ও ভাষা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্ব প্রকার ভাব প্রকাশের যোগ্যতা অর্জ্জন করেয়াছে। দেড়শত বৎসরের মধ্যে এই যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন,—রাষ্ট্রে, জীবনে ও সাহিত্যে এই যে অসাধারণ উন্নতি, ইহাতে বঙ্কিমের দান কতটুকু? আমরা আজ যাহা পাইয়া গর্ব অনুভব করিতেছি, বিশ্বের সম্মুখে আমাদের গৌরব বাড়িয়াছে, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের দানের ও ত্যাগের পরিণাম কী? বঙ্কিমকে সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে ইহাও জানিতে হইবে। উচ্চাঙ্গের রচনা, এইটাই কোন আদর্শ লেখকের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র নিদর্শন নহে। জাতির উপর, যুগের উপর তাঁহার প্রভাবের দিকটাও দেখিতে হইবে। এই প্রভাবের কথা ধরিতে গেলে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে, বঙ্কিম ছিলেন যুগ-প্রবর্তক। তিনি সকল দিকেই এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, তর্কের ভয় না করিয়াও বলিতে পারি যে, যুগসন্ধিক্ষণে তাঁহার পুণ্য আবির্ভাব না হইলে, বাঙালী আজ এমনটি হইত না, তাহার সাহিত্যও এত গৌরবোজ্জ্বল হইয়া উঠিত না। বাঙালী তাঁহার নিকট চিরঋণী। বাঙালী যে বঙ্কিমের নিকট ঋণী, একথা স্বীকার করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না,—কিন্তু বাঙ্গলার মুসলমানের কথা উঠিলে কেহ কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। মুসলমান যেন বাঙালী গোষ্ঠীর বাহিরে। বঙ্কিমের নিকট যদি বাঙালী ঋণী হয়, বাঙ্গলা ভাষা যদি ঋণী হয়, তবে বাঙালী মুসলমানও সমভাবে তাঁহার নিকট ঋণী, সর্ব্বাংশে ঋণী। আজ এই সত্যটাকে কৃতজ্ঞচিত্তে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে হইবে, নতুবা মুসলমানেরা অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী হইবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, বঙ্কিম বাঙালী মুসলমানের কে? সাহিত্যগুরুকে

সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইতে কেন তাহার এত কুণ্ঠা? তাঁহার নিকট আমাদের অপরিশোধ্য ঋণের কথা স্মরণ করিলে বলিতে হয় তিনি আমাদের সাহিত্য-গুরু। তিনি হিন্দুর নিকট যাহা, মুসলমানের নিকটও তাহাই। তিনি নব্য বাঙলার জন্মদাতা, সুতরাং মুসলমানও সেই সংজ্ঞা হইতে বাদ পড়ে না। কেহ কেহ অভিযোগ করিবেন, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান চরিত্র ভালভাবে অঙ্কিত করেন নাই, কোথাও কোথাও জঘন্যভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। সমালোচনার কষ্ঠি পাথর দিয়া যাচাই করিলে দেখা যাইবে, এই অভিযোগের অনেকখানি সত্য নহে। তিনি কোথাও ইসলাম ধর্ম'কে আক্রমণ করেন নাই, ইসলামের আদর্শ, ইসলামের পয়গম্বর, ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন হদীস, এসবের উপর কোথাও বিদ্রুপপূর্ণ আঁচড় কাটেন নাই। জায়েদ, রশীদ, সাদেকের মত কতকগুলি লোক, আর দু'পাঁচ জন বাদশা, বেগম ও শাহজাদা ও শাহজাদীকে কেন্দ্র করিয়া যে সব উপন্যাস তিনি লিখিয়াছেন, তাহার সহিত ইসলামের অথবা মুসলমানের নিগূঢ় সম্বন্ধ কী থাকিতে পারে যে তাঁহাদিগকে ছোট মাপে চিত্রিত করিলে মুসলমানের স্বার্থ ক্ষুন্ন হইবে? তা'ছাড়া যে সব বাদশা বেগমের চরিত্র সম্বন্ধে, অন্যপরে কা কথা, মুসলমান লেখকগণও একমত নহেন, কেহ নিন্দা করেন, কেহ প্রশংসা করেন, সে-ক্ষেত্রে অনুকূল মত গ্রহণ না করিয়া প্রতিকূল মত গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কী এমন অপরাধ করিয়াছেন, যে তাঁহার নিকট শতভাবে ঋণী থাকা সত্ত্বেও মুসলমানেরা আজ তাঁহাকে ক্ষমা করিতে ইতস্ততঃ করিবেন? একটু অন্তর্দৃষ্টি লইয়া বঙ্কিম সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, মুসলমানের পক্ষ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কতকগুলি কাল্পনিক, কতকগুলি বিদ্বেষ-প্রসূত, আর কতকগুলি আংশিক সত্য। এই আংশিক সত্যটাকেই গোটা সত্য বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ নাই। বেশ, স্বীকার করিলাম তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার নিকট মুসলমানের ঋণী থাকার কথা অসত্য হইয়া যাইবে? তাঁহার দু'একটা ভুলভ্রান্তি, দু'একটা গালিমন্দ কি বিস্মৃত হওয়াই মনুষ্যত্বের কাজ নহে? বঙ্কিমের মুসলিম বিদ্বেষের দিকটা খুব বড় করিয়া দেখান উচিত নহে, কারণ, তাহার নিকট মুসলমানের ঋণ অপরিশোধ্য। সুতরাং, দেখা যাক, এই ঋণটা কী পরিমাণের। দেড়শত বৎসর পূর্বে মুসলমান লেখকগণ যে বাঙ্গলা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা যে কী ধরণের বস্তু তাহা "সহি সোনাভান" ও "গোলে বাকাউলি" শ্রেণীর বহি পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তখনও মুসলমান সমাজ ইংরাজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শে আসিতে সে ছিল সদাই কুণ্ঠিত। সাহিত্য বলিতে তাহার তখন কিছুই ছিল না। আর যাহা ছিল, তাহা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য মোটেই ছিল না। ভূদেব, মধুসূদন, অক্ষয়চন্দ্র, হেমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মহারথিগণের পার্শ্বে দাঁড়াইবার মত লোক কেহই ছিল না। তখনও সে উর্দু ফারসীর মোহ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বাঙলার মৃত্তিকায় সে তখনও আফগানিস্থানের পেস্তা বাদামের চারা রোপন করিবার কল্পনায় বিভোর ছিল। কিন্তু তাহা ফলপ্রসূ হইল না, আর যাহা হইল, তাহা নীরস ও স্বাদহীন। মুসলমান সমাজই তাহা স্পর্শ না করিয়া প্রত্যাখান করিল। বহুদিন তাহার এই অবস্থায় কাটিল। সে করিল বাঙলা-সাহিত্য ও ভাষাকে সর্বতোভাবে অবহেলা। কিন্তু বাঙলা সাহিত্য তাহার সেবা ও সাধনা না পাইয়াও সমৃদ্ধিশালী হইতে লাগিল। যে কয়েকজন মহারথী অসাধ্য সাধনা ও তপস্যার দ্বারা বাঙলা সাহিত্যের সেবা করিতে লাগিলেন, তাহাকে নূতন নূতন রূপ দিতে লাগিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের সকলের পুরোভাগে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনিই বাংলা ভাষাকে আধুনিক করিয়া তুলিলেন, সর্বতোভাবে তাহাকে উন্নত ও মহিমান্বিত করিয়া তুলিলেন। তারপর যখন মুসলমানের উর্দু ফারসীর মোহ কাটিল, পেস্তা বাদামের আশা দুরাশায় পরিণত হইল, তখন সে আবার বাংলার মাটির দিকে মনোনিবেশ করিল। এবং যাহা পাইল, তাহা অনায়াসলব্ধ দৈব ফলস্বরূপ। সাধনা করিতে হয় নাই, তপস্যা করিতে হয় নাই, সংগ্রাম করিতে হয় নাই, যাহাকে বলে 'রাঁধা ভাতে হাত দেওয়া' সেই ভাবেই সে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ভাষার আশ্রয় পাইল। এই আশ্রয় যিনি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই ফল যিনি হাতের মুঠোর মধ্যে পুরিয়া দিলেন, তাহার নিকটে মুসলমানের ঋণের কি কোন সীমা থাকিতে পারে? আজ তাঁহাদের মধ্যে বড় বড় স্যাহিত্যিক হইয়াছেন—ফজলল্, করীম, এয়াকুব আলী, আব্দুল ওদুদ, নজরুল ইসলাম, জসিমুদ্দিন, গোলাম মুস্তাফা, কাদের নওরাজ, আব্দুল কাদির, বন্দে আলি মিঞা প্রভৃতির নামে আমরা আনন্দ পাই, কিন্তু ইহাঁরা থাকিতেন কোথায়, ইঁহাদিগকে পাইতাম কোথায়, বঙ্কিম যদি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া না রাখিতেন? বঙ্কিমের আজন্ম সাধনার ফল ইহাঁরা! কোথায় পাইতাম এরূপ উচ্চাঙ্গের ভাষা, উচ্চভাব প্রকাশের এরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ভঙ্গী, সর্বোপরি এইসব গ্রহণ করিবার মত আবহাওয়া ও পরিবেষ্টন, বঙ্কিম যদি আপ্রাণ সাধনা দ্বারা বাঙলা ভাষাকে গড়িয়া না লইতেন? সুতরাং বঙ্কিমকে সাহিত্যগুরু বলিয়া মানিতেই হইবে এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে এই ঋণ

স্বীকার করিতে হইবে, ভক্তিভাবে গুরুদক্ষিণা দিতে হইবে। 'আনন্দমঠের' অগ্নি উৎসবই কি সেই গুরুদক্ষিণা ? আফসোস!

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সভ্যতা ও সাংস্কৃতিকে খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন ও বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা শুধু এজন্য নয় যে তিনি হিন্দু, বরং এই জন্য যে, তিনি ভারতবাসী। এইখানে একটি প্রশ্ন উঠে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি এতদ্দেশীয় মুসলমানের আচরণ কিরূপ হইতে পারে ও কিরূপ হওয়া উচিত ? বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিকে মুসলমান কোন্ দৃষ্টিতে দেখিবে ? আটশত বৎসর পূর্বে মুসলমান যখন বিজয়ীর বেশে এদেশে আসিয়াছিল, তখন সে এগুলিকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল, আজ বহুযুগ পরে সে যখন এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে, তখন এগুলিকে ঠিক সেই দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না। আজ মুসলমানরা বিজেতা নহে, হিন্দুদের মত আজ তাহারাও বিজিত। তাহাদের সহিত মুসলমানেরা একাঙ্গী। তাহারাও ভারতবাসী, তাহারাও বাঙ্গালী। সুতরাং যত প্রাচীন কালেরই হউক না কেন, ভারতের বুকে যাহা জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা মুসলমানেরও সম্পত্তি। ইহাতে তাহাদেরও অংশ আছে, তাহাদেরও গৌরব করা উচিত। ঠিক এই ভাবটি কামাল আতাতুর্ক ও রেজাসাহ পাহলবী বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ইহারা স্ব স্ব দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্রাক্ ইসলামের যুগের সংস্কৃতি তাঁহাদের নিকট আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সে যুগের সভ্যতাকে ইঁহারা নিজস্ব সভ্যতা বলিয়া দাবী করিতেছেন, গর্ববোধ করিতেছেন। এবং তাহাকেই উদ্ধার করিবার জন্য কত চেষ্টা হইতেছে। মুসলমানকেও আজ তাহাই করিতে হইবে। মহাকবি কালিদাস তাহাদের পর নহেন, ভবভূতি, ভর্তৃহরি, বরাহমিহির, তাহাদের পর নহেন। অশোক, বিক্রমাদিত্য, হর্ষবর্দ্ধন বা সীতা, সাবিত্রী, রাম, লক্ষ্মণ, অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ভীম, যুধিষ্ঠির কেহই তাহাদের পর নহেন। ইহারা মুসলমানের অস্থি-মজ্জার সহিত জড়িত। তাঁহাদের আদর্শকে পদদলিত করিবার কোন কারণ নাই, দৈনন্দিন জীবনে তাঁহাকে আদরের ধন, বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে, বহির্ভারতীয় স্বধর্মপ্রীতি যেন কোন দিনই তাহাদিগকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ না করে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভালবাসিয়া মুসলমানের প্রতি কোনও অবিচার করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে, খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন তাহার আরও একটা কারণ তাঁহার গভীর স্বদেশ প্রীতি। এই স্বদেশ প্রীতির উপর জোর

দিবার জন্য প্রাচীন সভ্যতার ভাল দিকটাকে তিনি সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে যেন জাতি আত্মবিস্মৃত হইয়া না পড়ে। সুতরাং তাঁহার হিন্দু-প্রীতির গোড়ার কথা গভীর স্বদেশ-প্রীতি। তিনি দেখিলেন যে, পরাধীন জাতি স্বদেশ প্রীতি ব্যতীত উন্নত হইতে পারিবে না। এই কথাটাই তিনি নানাভাবে উপন্যাসে, প্রবন্ধে ও রঙ্গরসের মধ্যে বুঝাইয়া গিয়াছেন। সমগ্র বঙ্কিম সাহিত্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে এই স্বদেশ প্রীতির ভাবটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুসলমানকে আক্রমণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, মুসলিম আমলের অরাজক যুগের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক সমস্যার কতকটা সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, এরূপ যে কোন পাঠক বঙ্কিমের মধ্যে এই ভাবেরই প্রাবল্য দেখিতে পাইবেন। তাঁহার নিকট মুসলিম বিদ্বেষটা ফুটিয়া উঠিবে না, ফুটিয়া উঠিবে বঙ্কিমের স্বদেশ প্রীতির কথা। লর্ড রোনাল্ডশে (বর্ত্তমানে জেটল্যান্ড) তাঁহার Heart of Aryavarta নামক গ্রন্থে 'আনন্দমঠকে' a Parable of Patriotism বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোম্পানী আমলের সেই যুগটা দেশের সুখ শান্তির পক্ষে কী ভীষণ দিন ছিল, তাহা প্রত্যেক ইতিহাস পাঠককে স্বীকার করিতে হইবে। গুলিখোর মিরজাফর যে রাজ্যের নবাব, রক্ত শোষক রেজাখাঁ ও সিতাব রায় যে রাজ্যের রাজস্ব আদায়কারী তহসিলদার, অমাত্য ওমরাহ যে রাজ্যের চাটুকার মাত্র, সেনা বিভাগ যে রাজ্যের দুর্ব্বল ও বিকলাঙ্গ, আর ক্লাইভ যে রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের মূল কর্ত্তা, সে রাজ্যকে "শূকরের খোঁয়াড় ও বাবুয়ের বাসা" ব্যতীত আর কিভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে? এই বাবুয়ের বাসা ভাঙ্গিতে উৎসাহিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ প্রীতিরই পরিচয় দিয়াছেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে বঙ্কিমের ''আনন্দমঠ'' বুঝিবার যোগ্যতা সকলের হয় না। তিনি "ক্লাইভের গর্দ্দভ"কে বিতাড়িত করিতে চাহিয়াছিলেন, মুসলমানকে নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র জাতি বলিতে যাহা বুঝিয়াছিলেন, মুসলমান তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনি তাঁহার জাতির সংজ্ঞায় মুসলমানকেও পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধে ইহা পাওয়া যাইবে। তিনি সাত কোটি বাঙ্গালীকে প্রাণের দরদ দিয়া ভাল বাসিয়াছিলেন। বঙ্গজননীর সপ্ত কোটি সন্তানকেই তিনি স্বাধীনতার সংগ্রামে আহবান করিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলিম বিদ্বেষী মনে করিয়া তাঁহার প্রকৃত দানের মর্য্যাদা ভুলিলে চলিবে না। মুসলমানগণ নানা ভাবে তাঁহার নিকট ঋণী।

সাহিত্যে, রাজনৈতিক আদর্শে, নবভাবের প্রেরণার জন্য সর্বদিকে বঙ্কিম আমাদের পথ প্রদর্শক। তিনি দেশের রূপ বদলাইয়া দিয়াছেন, দেশকে সম্মাণিত করিয়াছেন, লোকের প্রাণে সাহস সঞ্চার করিয়াছেন, স্বাধীনতার মাদকতায় দেশবাসীকে পাগল করিয়া তুলিয়াছেন। উত্তর কালে যে স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলনের প্রবল বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল, তাহাতে বঙ্কিমের দান অসামান্য। আজ আমরা দেশে যে নূতন যুগ দেখিতেছি তাহাতেও বঙ্কিমের অনেক দান—একথা জোর গলায় স্বীকার করিতে হইবে। তাই আজ তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া—তাঁহাকে মুসলমানের বন্ধু বলিয়া অভিনন্দন জানাইতেছি।

রেজাউল করীমের প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকা

বাংলা

১। ফরাসী বিপ্লব (১৯৩৩; বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা)

২। স্পেন বিজয় (অর্দ্ধসমাপ্ত ও অপ্রকাশিত রচনা; সেকালের পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত)

৩। নয়া ভারতের ভিত্তি (১৩৪২; মডার্ণ বুক এজেন্সী) ১০, কলেজ স্কোয়ার)

৪। জাতীয়তার পথে (১৯৩৯)

৫। তুর্কীবীর কামাল পাশা (১৯৪১; ৩য় সংস্করণ ১৯৪২, মডার্ণ বুক এজেন্সী).

৬। পাকিস্থানের বিচার (১৯৪২).

৭। বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ (১৯৪৪, ২য় সংস্করণ ১৯৫৪ আর চ্যাটার্জী, ৮১ সিমলা স্ট্রীট).

৮। সাধক দারা শিকোহ (১৯৪৪, ২য় সংস্করণ ১৯৪৫, নূর লাইব্রেরী পাবলিশার্স, ১২/১ সারেঙ্গ লেন)

৯। মণীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ (২য় সংস্করণ ১৯৪৭, ৩য় সংস্করণ ১৯৪৮; নূর লাইব্রেরী পাবলিশার্স)

১০। জাগ্রহি (আর্য পাবলিশিং কোং).

১১। কাব্য-মালঞ্চ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক (রচনাকাল পর্যন্ত) মুসলিম কবিদের কবিতার সংকলন ; (১৯৪৫; নূর লাইব্রেরী পাবলিশার্স).

১২। আমরা যাহা বিশ্বাস করি (পুস্তিকা; কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে).

১৩। সাম্প্রদায়িকতা

ইংরাজী

1. For India and Islam—(1937; Chakravarty Chatterjee and Co. Ltd, 15, College Sq. Calcutta).
2. Anecdotes of Hazrat Muhammad (1939 Noor Library Publishers).
3. Pakistan Examined (Book Congress Ltd. Calcutta).
4. The Book of the Hour.
5. Muslims and the Congress (1941, Collection of Speeches from Muslim Presidents). Barendra Library, 204 Cornwallis Street, Calcutta).
6. Mother Kasturba Gandhi (1944, Chakravaıty Chatterjee & Co).

সম্পাদিত পত্রিকা ;

১। সৌরভ (অনিয়মিত; ১৯২৫, খাগড়া. বিনোদিনী প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ)
২। দূরবীন (আনুমানিক, ১৯৩৬; কলিকাতা)
৩। নবযুগ (সম্পাদক আহ্‌মদ আলীর সঙ্গে সহ সম্পাদনার কাজ করলেও মূলতঃ রেজাউল করীমই প্রধান কাজ করতেন, আনুমানিক ১৯৪৫-৪৬)
৪। মুর্শিদাবাদ পত্রিকা (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ)
৫। গণরাজ (সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম হিসাবে; বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ)